বক্তৃতা-স্তবক।

(নানা সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সংগ্রহ)

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY

DATTA, B. M. PRESS, 13, CORNWALLIS STREET.

1888.

মূল্য ।৵০ [illegible] মাত্র

বিজ্ঞাপন।

—:*:—

কলিকাতার ছাত্রসমাজে ও অন্যান্য স্থানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র মুদ্রিত করা গেল। ইহার অনেকগুলি অগ্রে স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সে আকারে থাকিলে হারাইয়া যায় এই জন্য একত্র সংগ্রহ করা গেল। এতদ্দ্বারা যদি কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলেই শ্রম সফল।

কলিকাতা
২রা মাঘ ১৮৯৪ সাল

সূচীপত্র।

মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল।

পাঠকদিগের মধ্যে বোধ হয় এমন একজনও লোক নাই, যাঁহাকে সময়ে সময়ে নিজের দুর্ব্বলতায় নিজে লজ্জিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে হয় নাই। জীবন-সংগ্রামে আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি, যেন কোন অলক্ষিত শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমাদের সাধু সংকল্পসকলকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে, আমাদের প্রতিদিনের শত শত প্রতিজ্ঞাকে চূর্ণ করিতেছে, আমাদিগকে কেশাকর্ষণ করিয়া রিপুকুলের পদতলে লুণ্ঠিত করিতেছে। যাঁহাদের সদসৎ জ্ঞান আছে, ধর্ম্মভয় আছে, অসৎবিষয় পরিহার পূর্ব্বক সৎবিষয় অবলম্বনে প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহাদের পক্ষে এ অবস্থার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আর কি হইতে পারে? এইরূপে নির্জ্জনে কত লোকের চক্ষে অনুতাপের অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? নরকুলে তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্, তাঁহারাই সুখী, যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না, যাঁহাদের বাসনা ও শক্তির সাম্য আছে এবং যাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বাহিরের জীবনে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সাধুদিগের জীবন আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহারা যখন নির্জ্জনে বসিয়া আত্ম-চিন্তায় রত হইতেন এবং তাঁহাদের নেত্রপ্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইত, সে সময়কার ভাবের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা কি অনুভব করি? কোন মনস্তাপে তাঁহা-

দিগকে ম্লান করিত ? কোন্ গূঢ় মানসিক ব্যাধি তাঁহাদিগকে অশ্রুজলে ভাসাইত ? চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির অসামঞ্জস্যই ঐ অনুতাপ ও অশ্রুর কারণ। তাঁহারা জীবন-সংগ্রামে যখন দেখিতেন যে, তাঁহাদের শক্তি তাঁহাদের ইচ্ছার অনুরূপ নয়, তখনই তাঁহাদের হৃদয় গভীর শোকে আকুল হইত ; তখনই তাঁহারা মনের ক্ষোভে মস্তকের কেশ ছিন্ন করিয়া ও পৃথিবীর ধূলিতে সেই মস্তক পূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। এইরূপে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আমাদের অনেককেই অনেক সময়ে পরিতাপিত হইতে হয়। সাধ করিয়া ঘরখানি বাঁধিলাম, হঠাৎ দুরন্ত ঝটিকা উত্থিত হইয়া আমার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল, তাহার মালমসলা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রহিল। সেই বিক্ষিপ্ত মালমসলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন দুঃখের সঞ্চার হয়, সেইরূপ আমরা অনেক কষ্টে যে চরিত্রের ঘর বাঁধি, তাহাও যখন প্রবৃত্তি বা প্রলোভনের আঘাতে ভগ্ন হইয়া যায় এবং তাহার মালমসলাগুলি হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া থাকে, তখন সেইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নির্জ্জনে অনেক অশ্রুপাত করিতে হয়। এইরূপে ভগ্ন চরিত্রের বিক্ষিপ্ত উপকরণ সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুণ্ণ হন নাই, এরূপ লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিজ্ঞার বলের অভাবে নিজ নিজ চরিত্রে যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি এবং তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় শোকসন্তপ্ত হয় ; সুতরাং সেই চরিত্রের বলের বৃদ্ধির উপায় কি, এ প্রশ্নের মীমাংসায় সকলেরই মনোযোগ হইবে।

কিন্তু মানবচরিত্রে প্রতিজ্ঞার বলের প্রয়োজন কত, তাহা জানিবার পূর্ব্বে মানবচরিত্র কি তাহা জানা আবশ্যক। অতএব অগ্রে সেই বিষয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আমরা আজি পর্য্যন্ত চরিত্রের তিনটী লক্ষণ শুনিয়াছি। প্রথমটী এই,—কোন ব্যক্তির সহিত মিশিয়া ও তাহাকে বার বার দেখিয়া তাহার চক্ষু মুখ নাসিকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের যেমন একটী সাধারণ সংস্কার (general idea) হয়, যাহাকে চলিত ভাষায় "আকৃতি" বলে,সেইরূপ লোকের সহিত মিশিয়া ও তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া তাহার হৃদয় মনের দোষগুণ সম্বন্ধে আমাদের একটী সাধারণ সংস্কার জন্মে, যাহাকে তাহার হৃদয় মনের চেহারা বলা যাইতে পারে, ইহাই তাহার চরিত্র। কোন বিদেশগত বন্ধুর কথা মনে করুন। তাঁহাকে স্মৃতিপথে আনিবামাত্র তাঁহার বাহিরের শরীরের একটী আকৃতি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইবে। অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু মুখ নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব আসিবে না; কিন্তু সমুদায় সম্বলিত ও সকলের সমষ্টি ভূত একটী স্থূল ভাব আসিবে; তাহাই তাঁহার শরীরের চেহারা বা আকৃতি। সেইরূপ কোন দূরস্থিত বন্ধুর নাম উল্লেখ করিলে, তাঁহার হৃদয় মনের যে ছবি মনে অঙ্কিত হয়, তাহা তাঁহার চরিত্র। সেই ছবি তাঁহার হৃদয় মনের গুণাবলির সমষ্টি-সম্ভূত।

দ্বিতীয় লক্ষণ:—মানবপ্রকৃতির অব্যক্ত গূঢ় শক্তিই চরিত্র। এই লক্ষণটী কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমে লোকের বিদ্যা বা ব্যুৎপত্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। বিদ্যা বা ব্যুৎপত্তি কাহাকে বলে? মনে

করুন একজন সুশিক্ষিত এবং বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি অল্পবয়স্ক শিশুদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার যতটুকু বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সেইটুকুই কি তাঁহার বিদ্যা ? তাহা নহে। সেই কার্য্যের পশ্চাতে যে অব্যক্ত গূঢ় শক্তি রহিয়াছে, যাঁহার প্রভাবে তিনি সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে পারিতেছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও এরূপ অনেক শিক্ষা দিতে পারিবেন, সেই অব্যক্ত গূঢ় শক্তিই তাঁহার বিদ্যা বা ব্যুৎপত্তি। একটী জাতির বিষয় চিন্তা করা যাউক ; এই যে ইংরাজেরা এ দেশ শাসন করিতেছেন, এই শাসনকার্য্যে তাঁহাদের যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, আমরা তাঁহাদের অনেক বিদ্যা বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইতেছি ; কিন্তু কেবল সেইটুকুই কি ইংলণ্ডের মহত্ত্ব ? তাহা নহে। এ বিদ্যা বুদ্ধি ও দক্ষতার পশ্চাতে, যে অব্যক্ত বহুদূর প্রসারিত বিদ্যা ও দক্ষতা রহিয়াছে, যাহার গুণে এরূপে সুশাসন করা সম্ভব হইয়াছে এবং যাহার প্রভাবে তাঁহাদের শত শত ব্যক্তিকে আজি হত্যা করিলে, তখনই অপর শত শত ব্যক্তি সেই স্থান অধিকার করিতে পারিবে, সেই গূঢ় শক্তি বা অব্যক্ত মানসিক বলবীর্য্যই ইংলণ্ডের মহত্ত্ব। অর্থাৎ, ভাবুন সেই দেশ কিরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন, যে দেশের প্রথম শ্রেণীর লোক গ্লাডষ্টোন্ প্রভৃতি এ দেশে আসিবার চিন্তাও কখনও করেন না, যে দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ফসেট্ প্রভৃতি, এ দেশে আসা আবশ্যক ভাবেন না, যে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর লোক গ্রাণ্ড ডফ্ প্রভৃতি উন্নত পদলাভ করিয়া কচিৎ এ দেশে আগমন করেন : সুতরাং যে

দেশের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর লোকের দ্বারাই, এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসিত ও সুরক্ষিত হইতেছে। অতএব ইংলণ্ডের যে বল আপনারা দেখিতেছেন তাহাতেই ইংলণ্ডের মহত্ত্ব নয়; কিন্তু যাহা দেখিতেছেন না, তাহাতেই মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। চরিত্র সম্বন্ধেও এইরূপ। কথা ও কাজে লোকের যতটুকু সাধুতার পরিচয় পাইতেছি, তাহার পশ্চাতে যে অব্যক্ত ও গভীর কূপ-সমান সাধুতার উৎস রহিয়াছে, যাহা হইতে ঐ কথা ও কাজ উৎপন্ন হইয়াছে ও আবশ্যক হইলে ঐরূপ শত শত কথা ও কাজ উৎপন্ন হইবে, মানবপ্রকৃতির সেই গূঢ় শক্তিই চরিত্র। ইহাকেই ধর্ম্মজীবন বলে।

এই চরিত্র যেখানে নাই, সেখানে মুখের কথা দ্বারা লোককে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করা যায় না। অধিক কি, ইতিহাসে আজ যাঁহাদের নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, যাঁহারা মুখের এক একটী কথাতে কত কত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদের অঙ্গুলির এক একটী সঙ্কেতে এক একটী জাতি মোহ-শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল মহাজনের কথা যদি স্মরণ করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? কিসের গুণে তাঁহাদের এত প্রভাব? কি জন্য তাঁহাদের এত আকর্ষণ? কেবল কি মুখের কথাতে? সেরূপ কথা এবং তদপেক্ষা উচ্চ উচ্চ কথা তো তুমি আমি প্রতিনিয়ত চারি দিকে বলিয়া বেড়াইতেছি, কই কয়জন আকৃষ্ট হইল? কয়জন জাগিল? কয়জনের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল? মানুষ যে কথা বলে তদ্দ্বারা কাজ হয় না, কিন্তু যাহা বলিতে বাকি রাখে, তদ্দ্বারাই কাজ হয়। অর্থাৎ সেই কথার পশ্চাতে যদি এমন কোন অব্যক্ত

সাধুতা না থাকে,যাহার ছায়া সেই কথার উপর পড়িয়া কথাকে সুন্দর করে, যাহা হইতে সেই কথা ও তদনুরূপ কত কথা উৎপন্ন হয়, তবে সে কথাকে গলিত পত্রের ন্যায় লোকে উপেক্ষা করে। জগতের মহাজনদিগের কথাতে যে লোকে আকৃষ্ট হইত, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া কাছে বসিয়া ও আলাপ করিয়া তাহারা অগ্রে দেখিত যে, তাঁহাদের অন্তরে অগাধ সাধুতার খনি, তৎপরে সেই সাধুতার ছায়া পড়াতেই এক একটী কথা জীবন্ত বীজের ন্যায় জীবন উৎপন্ন করিত। এই গূঢ় জীবনপ্রদ শক্তি, এই অব্যক্ত সাধুতা, এই হৃদয়নিহিত সাধুতার উৎস—ইহাই চরিত্র, ইহা মানব-প্রকৃতির সঞ্চিত বল (Reserve force)।

চরিত্রের তৃতীয় লক্ষণ এইঃ—মানব যেরূপ ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা আপনাকে চালিত করে ও যদ্দারা আপনাকে শাসিত করে, সেই ধর্ম্মনিয়ম ও সেই আত্মশাসন শক্তিই চরিত্র। এই অর্থে চরিত্র মানবের আয়ত্তাধীন ও আত্মশাসন শক্তি এবং প্রতিজ্ঞার বল সম্ভূত্। এই চরিত্র গঠন সম্বন্ধে মানবমনের সম্পূর্ণ আধিপত্য।

এখন বিবেচনা করা যাউক কি কি উপাদানে এই চরিত্র গঠিত হয়। সমুদায় চরিত্রবান্ ব্যক্তির মানসিক গুণাবলির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের চরিত্রের মূলে তিনটী উপাদান দৃষ্ট হইবে।

প্রথম উপাদান, ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস। ধর্ম্মের নিয়ম সকলে অবিচলিত আস্থা ভিন্ন কেহই অদ্যাপি চরিত্রবান্ লোক হইতে পারেন নাই; এই সংসারের প্রতিকূল স্রোত সকলের

মধ্যে কাহার সাধ্য মানবকে সুস্থির রাখে! আমাদের পদতলের মৃত্তিকা যেন নিরন্তর কালস্রোতে নীত হইয়া সরিয়া যাইতেছে; দাঁড়াইব কি, প্রবল স্রোত আসিয়া আঘাত করিতেছে! প্রলোভন সকল নানা দিকে আকর্ষণ করিতেছে; ধর্ম্মের সূক্ষ্ম নিয়ম সকল একবার দেখিতে পাইতেছি আবার প্রবৃত্তির কলুষিত জলের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতেছি। এই চঞ্চল, অস্থির, প্রতিকূল ঘটনাবলির মধ্যে আমাদিগকে সুস্থির রাখে কে? দেখিতে পাই যাঁহারা বিশ্বাস চক্ষে সেই সূক্ষ্ম নিয়মগুলি লক্ষ্য করিয়া তদুপরি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ সুস্থির থাকিতে পারেন। বিশেষ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ভিন্ন সে ধর্ম্ম নিয়মগুলি অবলম্বন করা যায় না। এক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দেখিবে যে, চারিদিকে অধর্ম্মের জয় হইতেছে, অধর্ম্মাচরণের দ্বারা লোকে সুখ-সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতেছে, পদে পদে ধর্ম্মনিয়ম সকল লঙ্ঘন করিতেছে, অথচ সে ব্যক্তি ধর্ম্মকে সার ভাবিয়া সেই পথ অবলম্বন করিবে, এ কি সাধারণ বিশ্বাসের কথা! এইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ভিন্ন অদ্যাপি কেহ মানবকুলে শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশে এক প্রকার পিপীলিকা আছে, তাহাদের অধ্যবসায় এত দৃঢ় যে, তাহারা যদি কোন বস্তুকে দংশন করে, আর যদি তুমি তাহাদের শরীর ধরিয়া টানাটানি কর, শরীরটী মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবে কিন্তু তথাপি তাহারা দংশন শিথিল করিবে না। জগতের চরিত্রবান ব্যক্তিগণও সেইরূপ প্রাণপণে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে যদি হত্যা কর, তাঁহারা মরিতে মরিতেও তাঁহা-

দের অবলম্বিত সত্যগুলিকে ধরিয়া থাকিবেন। ইতিহাসে এরূপ বিশ্বাসবান্ ব্যক্তির অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড সাহেব অতি দরিদ্র লোকের সন্তান ছিলেন। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে যখন সামান্য কার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার মানসে স্বগৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা তাঁহাকে একটী কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। (Dare to do the right, my boy) "বাছা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে ভয় পাইও না"। কি আশ্চর্য্য উপদেশই সেই দরিদ্রের পত্নীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল! গারফিল্ড নিজে বলিয়াছেন, মায়ের এই অমূল্য উপদেশ অবিনশ্বর অক্ষরে তাঁহার হৃদয়পটে চিরদিন অঙ্কিত ছিল। ইহারই গুণে তিনি বড় হইতে পারিয়াছিলেন। এই সামান্য কথা কয়টী তাঁহাকে অনেক সঙ্কটে উদ্ধার করিয়াছিল। ইহারই জন্য তিনি সাধুতাচরণে কখনও ভীত হইতেন না। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত ও উচ্চপদস্থ হইয়া যখন তাঁহাকে কার্য্যকালে লোকের প্রতিকূলতা ও আপত্তি পদে পদে সহ্য করিতে হইত, তখন তিনি জননীর পূর্ব্বের কথাগুলি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিতেন। ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মানবের মনুষ্যত্বই হয় না।

চরিত্রের দ্বিতীয় উপাদান, কর্ত্তৃত্বশক্তি জ্ঞান (sense of individuality)—আমার মানস রাজ্যে আমি কর্ত্তা, আমার সুকৃতি দুষ্কৃতির জন্য আমি দায়ী। আমার বিশ্বাস ও সংস্কার অনুসারে কার্য্য করিতে আমি স্বাধীন। তাহাতে হস্তক্ষেপ

কারতে কাহারও অধিকার নাই। এই জ্বলন্ত কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান সকল চরিত্রবান্ লোকের প্রকৃতির একটী প্রধান লক্ষণ। এই জন্য তাঁহারা অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা পুরুষ। তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন বা নির্য্যাতন দ্বারা দমন করা যায় না। তদ্দ্বারা তাঁহাদের তেজকে দশগুণ বৃদ্ধি করে। তাঁহারা যাহা করেন তাহা নিজের ভাব ও নিজের কাজ। পরের পুচ্ছলগ্ন হইয়া তৎপ্রদর্শিত পদবীর অনুসরণ করা, ইহা তাঁহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁহাদের অন্তর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তাঁহাদের আত্মা এই স্বাধীনতার বায়ু সম্ভোগ করিয়াই বল সঞ্চয় করে। তাঁহারা যখন এমন কথাও বলেন, যাহা অপর দশজনে পূর্ব্বে বলিয়াছে, তাহার মধ্যেও এক প্রকার নূতনতর সজীবতা, সতেজতা থাকে, কারণ পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছে বলিয়া বলা হয় না, কিন্তু চিন্তাজগতে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজেরা কুড়াইয়া পাইয়াছেন বলিয়াই বলেন। যে কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি হইতে বাহিরে তেজস্বিতা, সেই কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি হইতে অন্তরেও তেজস্বিতা। তাঁহারা অন্তরের রিপুকুলের প্রতি সর্ব্বদাই ভ্রূকুটী করিতেছেন। "কি! আমার চিত্তচাপল্য উপস্থিত করিস্" বলিয়া ইহাঁরা রিপুদলের প্রতি কর্কশ ভাবে তাকাইতেছেন। ইহাঁদের প্রকৃতি একদিকে এরূপ শক্ত যে, অতি কঠিন অস্ত্রও ভেদ করিতে পারে না অপর দিকে কোমল। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি", বাস্তবিক ইহাঁদের প্রকৃতি একদিকে বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন অপর দিকে পুষ্প অপেক্ষাও মৃদু।

তৃতীয় উপাদান, আত্মশাসন। আপনাকে যিনি স্বীয় শাসনে রাখিতে অসমর্থ তাঁহার চরিত্র অদ্যাপি গঠিত হয়

নাই। জগতের চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ এই গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।
কেবল বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্ম-নিয়ম সকলকে দেখিলেই হইবে না,
আপনাকে সেই সকল ধর্ম্ম-নিয়মের অনুগত করিতে পারাই
মহত্ত্ব। মানুষ যখন আপনার চিত্তকে আপনি শাসন করিয়া
আপনাকে ধর্ম্ম নিয়মের অনুগত করে, তদপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য
আর কিছুই নাই। আপনাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন করি-
বার চেষ্টাতেই মানুষের হৃদয় মনকে মহৎ করে। কারণ
স্বার্থপরতা ও সুখাশক্তিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে
মানুষ প্রকৃতরূপে কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে পারে না। এই
আত্মশাসনের শক্তি হইতেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উৎপন্ন
হয়। দাসত্ব বড় দুঃখের অবস্থা, স্বাধীন হওয়া বড় সুখ।
কিন্তু স্বীয় প্রবৃত্তি ও রিপুদিগের অধীন হওয়ার ন্যায় দাসত্ব
আর কি আছে? নিজের অন্তরে যে দাস, সে বাহিরে কতদিন
স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখিতে পারে? সামাজিক দাসত্ব,
রাজনৈতিক দাসত্ব, অপরাপর সকল প্রকার দাসত্বই এই ঘোর
আধ্যাত্মিক দাসত্বের প্রতিফলিত ফলমাত্র বলিলে অত্যুক্তি
হয় না।

মহামনা চরিত্রবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মশাসন-শক্তি
দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রবৃত্তির অধীন নন, কিন্তু
প্রবৃত্তি সকলই তাঁহাদের অধীন। তাঁহারা স্বেচ্ছামতে স্বীয়
স্বীয় মনকে যথেচ্ছপথে নিয়োগ করিয়া থাকেন। মনেরও
অভ্যাস ও শিক্ষা এইরূপ যে, সে অন্যপথে যায় না। ইংলণ্ডের
মহারাণী এলিজেবেথের চ্যান্সেলর লর্ড বর্লের বিষয় এইরূপ
উক্ত আছে যে, তিনি কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া

আপনার রাজকীয় পোষাক উন্মোচন করিয়া রাখিবার সময় বলিতেন "Lie there, Lord Chancellor" "অর্থাৎ লর্ড চ্যান-সেলর, ওইখানে থাক," ইহার পর যখন তিনি স্বীয় পরিবার মধ্যে পারিবারিক সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন আর রাজ্যের চিন্তা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিত না। মনস্বী লোকের চিহ্ন এই যে, তাঁহারা একটী চিন্তাকে বলিলেন দশ-দিন বিলম্ব কর, অমনি সে চিন্তাটী দশদিন আর মাথা তুলিবে না। নিজের হৃদয় মনের উপর যাঁহার এ প্রকার শক্তি আছে, তিনিই বীর, তিনিই স্বাধীন ; এইরূপ লোকেই জগৎকে পরি-চালিত করিয়া থাকে। "কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোক-ত্রয়ং জিতং" কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তিনি লোকত্রয়কে জয় করিয়াছেন। যীশু একবার তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া-ছিলেন,"সত্যকে জান, সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" বাস্তবিক সত্যের সঙ্গে একতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আমরা যে ভীরু, তাহার কারণ এই যে, আমরা ভিতরে দাস হইয়া রহিয়াছি। অন্তরে যে আপনার কর্তা, সে বাহিরে বীর।

এখন প্রশ্ন এই, আমাদের প্রতিজ্ঞার বল এত অল্প কেন? ইহার বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ—হয়ত অনেকে স্বৈরাচারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ পিতামাতার নিকট হইতে দুর্ব্বল দেহ মন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাহারও পিতা হয়ত সুরাপায়ী লোক ছিলেন। সুরাপান দ্বারা মানবের দেহের স্নায়ুগুলকে নিতান্ত দুর্ব্বল করে এবং প্রতিজ্ঞার বল হ্রাস করিয়া দেয় ; সুতরাং সন্তানও দুর্ব্বল প্রতিজ্ঞা পাইয়া জন্মগ্রহণ করে।

আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি যে, পিতামাতার কু-অভ্যাস নিবন্ধন হতভাগ্য সন্তানগুলি এত দুর্ব্বল হইয়া জন্মে যে, তাহাদের সহস্র চেষ্টা ও উদ্যম পদে পদে বিফল হইয়া যায়। শিক্ষিত যুবক, মনে রাখিও তোমার কদাচারের ফলভাগী কেবল তুমি নও, তোমার সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়তঃ, বালককাল হইতে আমরা আত্ম-সংযম শিক্ষা করি না। অনেক সময় বালক বালিকাকে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে দেওয়া হয়। সে জন্য তাহাদের চরিত্রে আত্ম-সংযম ও সহিষ্ণুতা, এই দুইটী গুণ জন্মে না; তাহার পর তাহাদের অন্তরে যে কোন ইচ্ছার উদয় হয়, আর তাহারা তাহাকে নিয়মিত করিতে পারে না। এরূপ প্রকৃতিতে প্রবৃত্তির বল অত্যন্ত অধিক এবং প্রতিজ্ঞার বল অতি অল্প হয়। কেবল যে অতিরিক্ত পান ভোজন ও নিষিদ্ধ ইন্দ্রিয় সেবা করিলেই স্বৈরাচার (self-indulgence) হয়, তাহা নহে; হৃদয় মনকে অসংযত ভাবে প্রবৃত্তি-স্রোতে নীয়মান হইতে দেওয়াই স্বৈরাচার। এতদ্দ্বারাও আত্মসংযমের শক্তিকে হ্রাস করে। অভ্যাসের এমনি প্রভাব যে, একবার যাহা অভ্যাস পায় তাহা হইতে হৃদয়কে নিবৃত্ত করা পরে কঠিন হইয়া পড়ে। যাহারা কিছুকাল প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভ কঠিন। ৫।১০ বৎসর যে ব্যক্তি কোন প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়াছে তাহার আত্মসংযমের স্পৃহাও ক্ষীণ হইয়া যায়, সে সহজে আপনাকে সৎ পথে চালিত করিতে পারে না; তাহার পুরাতন প্রভু তাহাকে বিবেকের কথা শুনিতে দেয় না।

তৃতীয়তঃ, কোন কোন লোকের প্রকৃতি ভাব-প্রধান (impulsive) দৃষ্ট হয়। তাহারা ভাব-স্রোতেই সতত ভাসিতেছে। তাহাদের উৎসাহাগ্নি এক কথায় জ্বলিয়া উঠে, আবার এক কথায় নিবিয়া যায়। এরূপ প্রকৃতিতে প্রতিজ্ঞা স্থায়ী হইতে পারে না; সুতরাং এরূপ প্রকৃতি, চরিত্র গঠনের প্রতিকূল।

প্রতিজ্ঞার বল বৃদ্ধি করিবারও তিনটী উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সামান্য সামান্য বিষয়েই দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অধীন হইয়া কার্য্য করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই সত্যের অনুসারে চলিবার চেষ্টা করা। কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে হইলে সুখ বা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে ভাবিবে, লোকভয়কে যদি গণ্য করি, স্বার্থনাশে যদি কাতর হই, বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যদি ক্ষুণ্ণ হই, সাংসারিক অসুবিধার দিকে যদি বার বার চাহিয়া দেখি, তবে মানুষ হইতে পারিব না। মনকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিয়া একবার যদি কর্ত্তব্য কার্য্য করাইয়া লইতে পারি তবেই পথ পরিষ্কার হইল।

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পণ্ডিত জেম্‌স্ মার্টিনো বলিয়াছেন, মানবের কর্ত্তব্য-পথ যেন কুয়াশাতে আচ্ছন্ন; সাহস করিয়া অগ্রসর হও, এখন যে স্থান ঘন নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, সেখানে তোমার দৃষ্টি চলিবে; আবার পশ্চাতে সরিয়া পড়, এখন যাহা পরিষ্কার দেখিতেছ, তাহাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। একজন ভক্ত লোক একবার

একটী গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আমার সমীপের পথ অন্ধকারময়, হে ঈশ্বর! তোমার আলোক একবার ধর যে, আমি একখানি পা ফেলিবার মত জমি দেখিয়া লই।" ভূতের ভয় তাহাদেরই অধিক, যাহারা ভূত মানে; কিন্তু যে ভূত মানে না ও সাহস করিয়া অগ্রসর হয়, তাহার পক্ষে ভূত নাই। কর্ত্তব্য পালনের পক্ষেও এই নিয়ম। যে ভীরু সে বিপদ কল্পনা করিয়া সেই ভয়ে জড় সড় হয়; যে বিশ্বাসী ও সাহসী সে বিপদ দেখিয়াও ভীত হয় না।

কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুগত হইতে গেলেই চিত্ত-সংযমের অভ্যাস করিতে হইবে। একটী স্থলে কৃতকার্য্য হইলে আরও দশটী-স্থলে আশা ও সাহস বৃদ্ধি পাইবে। মানুষের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যে পরিমাণে আপনার গূঢ় শক্তির পরিচয় পায়, সেই পরিমাণে তাহার উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শিশু প্রথম যে দিন দুই পা চলিতে পারিল সেদিন তাহার জীবনের এক প্রধান দিন। সে আপনার শক্তি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হয়। তৎপরে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা দায়। সেইরূপ যে বালক কঠোর শাসনে রক্ষিত, যে স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে পায় না, এবং পিতা যাহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করেন, সে যদি দৈবাৎ ভার-প্রাপ্ত হইয়া কোন্ একটী বুদ্ধির কাজ করিতে পায়, অমনি তাহার উৎসাহ দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। লোকসমাজে বক্তৃতা করিবার নামে যিনি কম্পিত হন, তিনি যদি একদিন ভাল বলিতে পারিলেন, অমনি তাঁহার জীবনের উন্নতির আর একটী দ্বার খুলিয়া গেল।

সেইরূপ একটী স্থলে আপনাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন করিতে পারিলে, লোকের সাহস ও সৎপ্রবৃত্তি দশগুণ বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয় উপায়, চরিত্রবান্ লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ করা। সাধুমনা ও মনস্বী লোকদিগের জীবন-চরিত পাঠের উপকার অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, এক এক জন মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিতে করিতে আমাদের দুর্ব্বল প্রকৃতিকে যেন জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের অন্তরে সাহস ও বল বাড়াইয়াছে, আমাদের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে। আমার একজন বন্ধু একদিন আমাকে বলিলেন, রেনানের লিখিত খ্রীষ্টের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত কয়েক মাস যেন আশ্চর্য্য ভাবের তরঙ্গে ভাসিতেছিল। যদি কেহ নিজ চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা করেন, যদি প্রতিজ্ঞার বল চান, তবে তিনি জগতের সাধু মহাত্মাদিগের জীবনচরিত মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করুন।

প্রতিজ্ঞার বলবৃদ্ধির তৃতীয় উপায়টী ঈশ্বরের উপাসক মাত্রেরই বিদিত। তাহা কেবল আন্তরিক সরল প্রার্থনা। মানবাত্মাতে বল ও আশা দিবার এমন দ্বিতীয় উপায় নাই। যাঁহারা কখনও একান্তে মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিন এক বাক্যে এই কথারই সাক্ষী দিতেছেন। প্রার্থনা দ্বারা মানব অন্তরে কি সুমহৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, কি আশ্চর্য্য বল ও তেজ অবতীর্ণ হয়, কি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় সামান্য প্রলোভনের বাতাসে

কম্পিত হইতেছিল, প্রার্থনার গুণে তাহার অন্তরে যেন বজ্রের বল উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম জগতে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই বলি প্রার্থনাই আত্মার অন্ন পান, প্রার্থনাই ধর্ম্ম জীবনের প্রধান সম্বল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি অধিক কথা জানি না এবং শিখি নাই,। একটী সত্য শিখিয়াছি এবং সেই সত্যটীই প্রাণপণে ধরিয়া আছি। সে সত্যটী এই, যে বলের দ্বারা মানুষ পাপ তাপ হইতে রক্ষা পায়, সে বল ঈশ্বরের বল। প্রার্থনাই মনুষ্যকে সেই বল দিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মপথের পথিক মাত্রেই প্রাণপণে প্রার্থনাকে আশ্রয় ও সহায়রূপে অবলম্বন করুন।

সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি।

বর্ত্তমান সময়ে দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক সমাজ-রক্ষার জন্য ব্যস্ত,—চিরাগত প্রথা, রীতি, নীতি সকল যাহাতে সমাজে রক্ষা পায় তাহার জন্য ব্যগ্র; আর এক শ্রেণী সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যস্ত;—কিসে সমাজ সকল প্রকার উন্নতির দিকেই ধাবিত হইবে তাহার জন্য ব্যগ্র। এই দুই দলের লোক সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে। চিরদিনই ইহাঁদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের (conservative and liberal— পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে Whig and Tory বলিত) মধ্যে বহু কাল হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। যেখানেই কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছে সেইস্থলেই এই দুই দল দেখা দিয়াছে। যাঁহারা রক্ষণশীল নামে প্রসিদ্ধ তাঁহারা যে উন্নতি চাহেন না, এমত নহে, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে ভূতকালে যাহা ছিল তাহা সমুদায়ই ভাল এবং তাহা সংরক্ষণ করা সামাজিক উন্নতির প্রধান উপায়। আর এক শ্রেণী বলিতেছেন প্রাচীনের সংশোধন চাই। এক শ্রেণী ভূতকালে গৃহ নির্ম্মাণ করেন; আর এক শ্রেণী ভবিষ্যতে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এক শ্রেণী উন্নতির আদর্শের জন্য ভূতকালের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকেন; আর এক শ্রেণী আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের

দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এক শ্রেণীর লোক মনে করেন সত্য যুগ পশ্চাতে, আর এক শ্রেণী ভাবিয়া থাকেন সত্যযুগ সম্মুখে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, যে সভ্যতাই বৰ্দ্ধিত হউক আর যাহাই হউক, সমাজ যে দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর দুর্গতিতে পড়িতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর এক শ্রেণী বলিতেছেন সমাজ দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থাতে উন্নীত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির আশা আছে।

চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে জগতের ধৰ্ম্মশাস্ত্র সকলও এই উভয় মতের কোন না কোন মতের উপরে তাঁহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাইবেল গ্রন্থে বলে আদিম কালে মানব পূর্ণ সুখের অবস্থায় ছিল; দুঃখ ছিল না; ক্লেশ ছিল না; পাপ ছিল না; তৎপরে শয়তানের কুপরামর্শে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্যতাচরণ করিয়া জগতে দুর্গতি আনয়ন করিল। তদবধি জগৎ ক্রমে গভীরতর দুর্গতির অবস্থাতেই পড়িতেছে। হিন্দুশাস্ত্রেও এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে সত্যযুগে ধৰ্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল; ত্রেতায় তিন ভাগ ধৰ্ম্ম, এক ভাগ পাপ; দ্বাপরে অৰ্দ্ধেক ধৰ্ম্ম, অৰ্দ্ধেক পাপ; কলিতে একভাগ ধৰ্ম্ম তিন ভাগ পাপ; এইরূপে সংসার ক্রমশই অবনতির দিকে যাইতেছে। রক্ষণশীলদিগের এইরূপ মত; এবং এই শ্রেণীর লোকই জগতে অধিক। কিন্তু ইতিবৃত্তে দেখি সময়ে সময়ে আর এক দল লোক বুক বাঁধিয়া এই আশায় সংগ্রাম করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে। ইহাঁরা এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া জগতের দুঃখভার হরণের

নিমিত্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত দান করিয়াছেন; অগ্নিতে শরীরকে দগ্ধ করিয়াছেন; অম্লানমুখে সকল প্রকার যাতনা সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টার সুফল ভবিষ্যতে ফলিবে এ বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কখনই এত ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহাঁরা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক। এই যে দুইটী বিরুদ্ধভাব, ইহার ভিতর গূঢ়রূপে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে যে, একশ্রেণীর লোকের শাস্ত্র নিরাশা ও অবিশ্বাসের শাস্ত্র। তাঁহাদের ভবিষ্যতে নির্ভর নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে একজন আমাদের উপরে আছেন যাঁহার সর্ব্ব বিজয়ী ইচ্ছা নিরন্তর আমাদের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিতেছে। তাঁহারা ভাবেন মানুষ যেন ভগবানের ত্যজ্যপুত্র হইয়াছে, মানবকে তিনি বিনাশের হস্তে চিরদিনের মত সমর্পণ করিয়া উদাসীন হইয়াছেন। আর এক শ্রেণীর লোকের শাস্ত্র, আশা ও বিশ্বাসের শাস্ত্র। তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, সকল কার্য্যের অন্তরালে এমন একজন আছেন, যিনি ভবিষ্যতে মঙ্গল করিবেনই করিবেন। তাঁহারা বিশ্বাসের চক্ষে জগতের ইতিহাসে দেখিয়াছেন যে তিনি অমঙ্গলের মধ্যে সুদিন আনিয়াছেন, অসত্যের উপরে সত্যকে জয়ী করিয়াছেন।

ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে কতকগুলি লোকের প্রেমের ভাব কিছু বেশী;—তাঁহারা প্রেমিক ও প্রসন্ন। যে সকল বিপদে অন্য লোকে দমিয়া যায়, তাঁহারা সেই সকল বিপদ রাশির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়াও দমেন না, হেলেন না; সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকেন। তাঁহারা প্রেমের চক্ষে মানব-সংসারকে দর্শন করেন, প্রেমের চক্ষে ইতিহাসের

ঘটনাবলী পাঠ করেন, প্রেমের চক্ষে মানবের পাপ ও দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করেন; সুতরাং তাঁহারা জগতের দুঃখ-রাশির মধ্যেও আশার বিষয় অনেক দেখিতে পান। পাপ তাপ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্ত একেবারে চটিয়া যায় না। আবার দেখা যায় কতকগুলি লোক স্বভাবতঃই অপ্রেমিক ও চাপা। তাঁহারা মনের ভাব কাহাকেও বলেন না, মন খুলিয়া কাহারও সহিত মিশিতে চাহেন না। তাঁহারা নিজের চিন্তা-রাজ্যে নিজেই ঘুরিয়া বেড়ান, মনের মধ্যে আগুণ জালিয়া নিজেরাই তাহাতে জ্বলিয়া মরেন। মনে অপ্রেমের ভাব থাকায় জগতের কোন কার্য্যের প্রতিই প্রসন্ন নয়নে চাহিতে পারেন না। ফল এই হয় যে তাঁহারা জগতে ভাল কার্য্য বড় দেখিতে পান না; মন্দই চক্ষে বেশী পড়ে; সুতরাং মনে সর্ব্বদা অশান্তি বিরাজ করে এবং তাঁহারা নরবিদ্বেষী হইয়া দাঁড়ান। তাঁহারা প্রেম দেন না সুতরাং প্রেম পানও না। মনে করেন বুঝি বা পৃথিবীর লোক গুলো কেবল স্বার্থপর। কেহ হয়ত নিঃস্বার্থ দয়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জগতের উপকারের জন্য, পরের দুঃখ মোচনের জন্য কোন কার্য্য করিতেছে, তাঁহারা অমনি মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া কোন দোষ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। "দাঁড়াও ইহার ভিতরে কিছু মতলব আছে।" এইরূপ কেবল মন্দ দেখিতে দেখিতে ও অসদভিসন্ধির আরোপ করিতে করিতে মনও বিষাক্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহারা বলিতে থাকেন, ভূতকালে যাহা ছিল ভাল ছিল বর্ত্তমানে সকলই মন্দ। আর যাঁহাদের স্বভাব প্রেমিক, তাঁহাদের চক্ষে লোকের দোষ বড় ঠেকে না; তাঁহারা লোকের গুণই দেখেন; তাঁহারা

বিশ্বাস করেন লোকের আশা আছে ; ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে। এই প্রকৃতিগত প্রভেদ থাকা বশতঃ স্বভাবতঃ দুইটী দল হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানের সহিত তুলনায় ভূতকালকে সুন্দর দেখা বড় স্বাভাবিক। মানুষ সচরাচর একটা বড় বিষম ভ্রান্তিতে পড়ে। আমরা ভূতকালের সহিত যখন বর্ত্তমানের তুলনা করি তখন বর্ত্তমানকে নিতান্ত হীন দেখিতে পাই। তাহার কারণ এই যে অতীতের বিষয় আমরা চক্ষে দেখি নাই ; কিন্তু ইতিহাসে পাঠ করি। ইতিবৃত্তে মানুষ কিরূপ বিবরণ রাখে ? সমাজের প্রতিদিনের বিবাদ কলহ, রক্তপাত, হিংসা, বিদ্বেষ, দুষ্ক্রিয়া প্রভৃতির বিবরণ কে যত্ন করিয়া ইতিহাসে লিখিয়া রাখে ? কিন্তু বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা সাধুতার সঙ্গে অসাধুতা, প্রণয়ের সঙ্গে বিরোধ, বিবাদ কলহ দুষ্ক্রিয়া প্রভৃতি প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই সুতরাং তুলনায় ভূতকালকে সুন্দর দেখি। এই জন্য 'প্রাচীন ভারত' একথা বলিবা মাত্র সকলের মনে হইবে মহাকবি বাল্মীকি ও তাঁহার কাব্য, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ও বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি ;—কিন্তু এ সকল যদি মুছিয়া দেওয়া যায়, তবে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কি শ্রদ্ধার বস্তু ? প্রাচীন ভারতের সামাজিক দুষ্ক্রিয়া সকল কি কেহ যত্নপূর্ব্বক ইতিবৃত্তে লিখিয়াছে ? কোন্ দিন কোন্ রবিবার কোথায় কে সুরাপান করিয়া অমানুষিক কার্য্য করিয়াছে, তাহা কি কেহ যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিয়াছেন ?—না—ইতিহাসে সমাজের প্রতিদিনের দুষ্ক্রিয়া সকল লিখিত নাই : কীর্ত্তি সকলই লিখিত আছে।

যেগুলিতে প্রাচীন ভারতের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলিই কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং ইতিবৃত্তে পাপের ছবি পাই না, কিন্তু ধর্ম্মের ছবিগুলিই দেখিতে পাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যেমন এক দিকে প্রেম দেখিতে পাই, ধর্ম্ম দেখিতে পাই, সতীত্বের সুন্দর ছবি দেখিতে পাই, তেমনি তৎসঙ্গে আর এক দিকে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত দেখি; গভীর নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে রাজপথে ভয়ানক নৃশংস ব্যাপার দেখিতে পাই; রক্তস্রোত ও ব্যভিচারের ভয়ানক লোমহর্ষণ চিত্র চারি দিকে দেখিতে পাই; সুতরাং ইহা হইতে মুখ ফিরাইয়া অতীতের সুন্দর ছবি দেখিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। বর্ত্তমানের বীভৎস ছবি দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তাই অতীতের দিকেই তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। এই কারণেই দেশের বহুসংখ্যক চিন্তাবিহীন লোক ভাবিয়া থাকে যে ভূতকালের সবই ভাল—এবং বর্ত্তমানে সবই মন্দ।

রক্ষণ-শীলতার আর একটী কারণ এই যে, আমাদের সমাজের কোন রীতি নীতি একবার দাঁড়াইয়া গেলে তাহা যদি কুৎসিত হয়, তথাপিও সামাজিক জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া যায়, এবং একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে পরে আর তাহাকে সহজে উন্মূলিত করিতে পারা যায় না। তখন টানিতে গেলে একেবারে সমগ্র সমাজের উপর টান পড়ে। মনে কর একটি ছেলে ব্যায়াম করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া তাহার হাতখানি ভাঙ্গিয়াছে। তখন যদি তাহার হাড় দুখানি ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে কিছু কষ্ট হইবে কিন্তু ক্রমে সারিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার অবিভাবক তাহা না করিয়া সেই

ভাঙ্গা স্থানে চুণ হলুদ মাখাইয়া দিলেন। কিছু কাল এইরূপ দেওয়াতে বেদনা সারিয়া গেল বটে, কিন্তু হাতখানি আর পূর্ব্বের মত হইল না। তখন যতই সোজা করিতে চেষ্টা করা যায়, ততই সে ছেলের সমস্ত শরীরে টান পড়ে সে সহ্য করিতে পারে না। সেইরূপ সমাজ মধ্যে কোন প্রথা একবার দাঁড়াইয়া গেলে, ঠিক্ ঠিক্ বসিয়া গেলে, পরে তাহা তুলিতে গেলে সমুদায় সমাজের উপর টান পড়ে।

অথবা মনে করুন, কোন বাড়ীর ছাদে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ বসিয়াছে; প্রতিবেশীরা তাহা দেখিয়া গৃহকর্ত্তাকে বলিলেন, "ওগো তোমার বাড়ীর ছাতে একটা অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে, ওটাকে তুলিয়া ফেল; ছাদে গাছটা হওয়া বড় ভাল নহে" তিনি বলিলেন, হাঁ তুলিয়া ফেলা যাইবে; কিন্তু এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হইলেন, সে দিকে আর মনোযোগ রহিল না। ক্রমে ক্রমে সে গাছ বাড়িতে লাগিল; দু চার বৎসর পরে সে গাছের শিকড় এমন বসিয়া গেল যে, তখন পাঁচজনে টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারা গেল না। তখন তাহাকে তুলিতে গেলে থিলানে টান পড়িল, সুতরাং তখন বলিতে হইল, 'থাক্ তুল্লে দেয়ালটাও ভেঙ্গে যাবে।' এই প্রকার সামাজিক রীতি, নীতি বা প্রথা সৎ হউক, আর অসৎ হউক, একবার বসিয়া গেলে আর তুলা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তুলিতে গেলে সমাজ শুদ্ধ টান পড়ে; সুতরাং লোকে বলে উঠাইয়া কাজ নাই। এই কারণে মানুষ রক্ষণশীল হয়।

আর এক কারণে মানুষ রক্ষণশীল হয়। সে এই যে, অনেক দিন যে কোন রীতি বা প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সেই

রীতি বা প্রথায় কিরূপে সমাজ চলিতে পারে, তাহা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়। চিরাগত প্রথা অনুসারে সমাজ চালাইতে হইলে কিরূপ করিতে হয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু নূতন কোন নিয়ম বা প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে তদ্দ্বারা কিরূপে সমাজ চলিবে, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। যেমন, জাতিভেদ রাখিয়া কিরূপে সমাজ চালাইতে হয়,তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি ; একজন ইংরাজ মাথা ঘুরাইয়া চিন্তা করিয়াও ধারণা করিতে পারিবে না জাতিভেদ রাখিয়া কিরূপে সমাজ চলিতে পারে ? সে ভাবিবে ব্রাহ্মণ শূদ্রের হুঁকায় তামাক খাইবে না, দুই জাতীয় লোক একত্র আহার করিবে না, অপর জাতির সহিত এক নৌকায় যাইবে না,এরূপ করিয়া কি সমাজ চলিতে পারে ? আমরা কিন্তু ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। আমরা ব্রাহ্মণের হুকায় একটি কড়ি বাঁধিয়া দি সকলেই তাহাতে বুঝিতে পারে যে তাহা ব্রাহ্মণের হুঁকা। জাতিভেদের মধ্যে বাস করিয়া ও অভ্যস্ত হইয়া এখন আমরা ধারণাও করিতে পারি না জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে সমাজ কিরূপে চলিতে পারে। যখন কেহ বলে জাতিভেদ তুলিয়া দেও, তখন আমাদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় ; মনে হয় সর্ব্বনাশ ! এ ত সমাজ ছারখারে দিবার কথা। এ বন্ধন তুলিয়া দিয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিবে কে ? সুতরাং এ প্রস্তাব যে করে, তাহাকে সমাজের শত্রু বলিয়া মনে হয়। আর এ প্রস্তাব শুনিতে ইচ্ছা করি না। মানুষের স্বভাব এই যাহা বুঝিতে ক্লেশ হয়,তাহা ভালবাসে না। কেহ যদি দুইখানি পুস্তক পড়িতে পান, তার একখানির ভাষা এমন কটমটে দুরূহ ও

নীরস যে, তাহা বুঝিতেই পারেন না, বুঝিতে কষ্ট বোধ হয়, আর একখানির ভাষা তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন, তখন অবশ্য তিনি যেখানি বুঝিতে পারেন, সেই খানিই পড়িতে ইচ্ছা করিবেন। সুতরাং মানুষ স্বভাবতঃই রক্ষণশীল হয়।

চতুর্থতঃ, কোন একটি প্রথার দ্বারা অনেক দিন চালিত হইলে মানুষের রুচি ও বিশ্বাস সেইরূপ দাঁড়াইয়া যায়। জাতি-ভেদ দ্বারা চিরদিন চালিত হইয়া আসাতে জাতিভেদ থাকা উচিত এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এখন যদি লোকের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কথা বলা যায়, তবে লোকের বদ্ধমূল সংস্কারের উপর ঘা পড়ে। যদি আমার জননীকে অনেক বুঝাইয়া বলা যায় যে 'মা ভেবে দেখ তুমিও যে মানুষ আর সকলেও সেই মানুষ, তুমি যখন জন্মেছিলে তখন তোমার কপালে কি ব্রাহ্মণ বলে লেখা ছিল? তবে কেন তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া অপরকে ঘৃণা কর?' একথা তাঁহার মনের ত্রিসীমাতেও স্থান পাইবে না; জাতিভেদ মানিয়া এমন রুচি ও বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধভাব মনে ধারণা হইবে না। যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করা যায়, রুচি প্রভৃতিও যে সেইরূপ হইয়া যাইবে, ইহা অতি নিশ্চয় কথা।

মনু বলিয়াছেন, সুরাপান যে করে সে মহাপাতকী, তাহার সংস্রবে যে থাকে সেও মহাপাতকী। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় সুরাপান নিষেধ, সুতরাং আমরা তাহা নিতান্ত মন্দ মনে করি;—কিন্তু ইংরাজগণ প্রতিদিনই সুরাপান করিতে-ছেন; তাঁহারা সুরাপানকে একটা পাপ মনে করেন না।

পঞ্চমতঃ আমরা যে সকল চিরাগত সামাজিক প্রথা ও রীতি

নীতি দেখিয়া আসিতেছি, মনে করি যে সমাজের রক্ষা এবং উন্নতি এই সকল ব্যবস্থা সাপেক্ষ। এই সকল না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। সুতরাং তদ্বিপরীত কিছু শুনিলেই স্বভাবতঃই মনে হয় যে সমাজ উৎসন্ন যাইবে, (Social Anarchy) সামাজিক অরাজকতা উপস্থিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন স্ত্রী-স্বাধীনতা। আমাদের দেশের লোক মনে করেন, সমাজের স্থিতি ও রক্ষার জন্য নারীর অবরোধ অত্যাবশ্যক, এবং চিরদিন তাহাই করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিলেই অনেকের মনে হয় (এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক) যে সর্ব্বনাশ হইবে, সমাজ নষ্ট হইবে, রসাতলে যাইবে। লোকে যেরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া আসিতেছে, তদ্বিপরীত কোন অবস্থায় সমাজ দাঁড়াইতে পারে কি না, তাহারা ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং ভূতকালের ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই উদিত হয়।

এই রক্ষণশীলতার অনেক উপকারও আছে। ইহার গুণে সমাজের ভাল ব্যবস্থা যেগুলি সেগুলি নষ্ট হইতে পায় না, সেগুলি থাকিয়া যায়। মনে করুন, এমন পাঁচজন লোক কোন একটী কাজ করিবার জন্য জুটিয়াছেন, যাঁহাদের মতি দুই দিনের জন্য স্থির নয়। আজ যাহা গড়েন, কল্যই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন; কাল যাহা গড়েন, পরশু তাহা বিনষ্ট করেন। এইরূপ নিত্য নূতন নূতন মতলব। তবে তাঁহাদের দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে কি না? এরূপ লোকের দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে না, কারণ সামাজিক উন্নতি বিষয়ে, আজ বীজ বপন করিলে হয়ত শতাব্দী পরে সুফল দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাজিক বিষয়ে ভেক্কীর ন্যায় এই আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়া তৎপরক্ষণেই ফল লাভ হয় না; কিন্তু কালের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সুতরাং যদি ভগবান রক্ষণশীলতার ভাব মনে স্বাভাবিক করিয়া না দিতেন, তবে প্রাচীনকালের কোন কীর্ত্তি, কোন সুন্দর ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিত না। যদি রক্ষণশীলতার ভাব মানব মনে স্বাভাবিক না হইত, তবে আজ আপনারা প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন কীর্ত্তি দেখিতে পাইতেন না। তবে আজ নানক, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা পাইতেন না; সেই সকল মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তি, সময়ের তরঙ্গে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া যাইত, তাহার উদ্দেশ থাকিত না। প্রাচীনের প্রতি আদর না থাকিলে মানুষ কি ঋগ্বেদের শ্লোক যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিত? যদি ভূতকালের প্রতি আদর না থাকিত, তবে কি আজ আপনারা হস্তলিখিত এই প্রকাণ্ড রামায়ণ ও মহাভারত পাইতেন? অতএব জগদীশ্বর এই রক্ষণশীলতার মধ্যে মহৎ কল্যাণ নিহিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের ভাল বীজ নষ্ট হইতে দেন নাই। রক্ষণশীলতায় যেমন উপকার আছে, তেমনি অপকারও আছে। আবার ইহারই জন্য অসৎ ব্যবস্থা, কুপ্রথা দুর্নীতি সকলও সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন এক জাতিভেদ প্রথা কত নরনারীকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া কত লক্ষ লোকের কণ্ঠে পা দিয়া নির্যাতন করিয়াছে, নানা প্রকার কুপ্রথা অল্পে অল্পে বদ্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিতে রক্তে মাংসে বসিয়া গিয়াছে। আজ সংস্কারকগণ এই বলিয়া কাঁদিতেছেন, হায়! হায়! ঐ কত অসংখ্য বিধবার ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ

বিদীর্ণ হইতেছে; তাঁহাদের নিঃশ্বাসে চতুর্দ্দিকের বায়ু উত্তপ্ত হইতেছে। এই ক্রন্দন অব্যক্তস্বরে নিরন্তর উত্থিত হইতেছে;— "হে বিধি! হিন্দুনারীর প্রতি সদয় হও।" কিন্তু সমাজের কঠিন পাষাণময় ব্যবস্থা সকল সে ক্রন্দনে টলিতেছে না। যাহা একবার দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহা আর উঠাইতে পারা যাইতেছে না। এই রক্ষণশীলতা সমাজকে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। সমাজের লক্ষ্য যাহাতে নরনারী স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছা-মতে ভগবানের কার্য্যে আপনাদের দেহ মনের শক্তি সকলকে নিয়োজিত করিতে পারে, তাহার সহায়তা করা। শরীর রক্ষার জন্য সমাজ সহায়তা করিতেছে। মনে করুন শীত নিবারণের জন্য আমি যে বস্ত্রখানি গায়ে দি, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য জনসমাজের কত লোক খাটিয়াছে, তবে আমি সেই বস্ত্র কিনিয়া গায়ে দিয়াছি। এইরূপে দেখিতে গেলে সমাজের প্রত্যেকে পরস্পর পরস্পরের শরীর রক্ষার জন্য খাটিতেছে। তেমনি আত্মার সম্বন্ধে সমাজের গুরুতর দায়িত্ব আছে। সত্য ন্যায়, পবিত্রতা, প্রেম আত্মার অন্নপান—এই গুলিকে যোগান ও সমাজের এক প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি দেখা যায় যে সমাজের ব্যবস্থা এরূপ যে তদনুসারে পাঁচ জন সুখী থাকে আর দশ জনকে অসুখী করিতে হয়, যদি এমন দেখা যায় যে সমাজের ব্যবস্থা সকল মানুষকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিতেছে না, সামাজিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বকে নির্ব্বাণ করিতেছে, বহুসংখ্যক নরনারীর গলে রজ্জ দিয়া দুর্গতিতে ডুবাইতেছে, বহুসংখ্যক লোককে অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন রাখিতেছে, তবে বলিব সমাজ উন্নতির সহায় নয়।

হইয়া দুর্গতির কারণ হইয়াছে। মনে করুন এমন কোন নিয়ম হইল যে জমিদারের নিকট গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্দিষ্ট কর গ্রহণ করিবেন তাহা আর বাড়াইতে পারিবেন না, অথচ জমিদারগণ প্রজাদের নিকট যথেচ্ছ খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, ইহাতে ফল এই দাঁড়ায় যে প্রজাদের ক্ষতি করিয়া, তাহাদের রক্ত শুষিয়া, খাজানার টাকা আদায় করিবে অথচ সেই টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে না। জমিদারের হাতে গিয়া জমিবে। সামাজিক নিয়মে যদি এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন, যে ব্রাহ্মণের হাতেই যজন যাজন প্রভৃতি সকল অধিকার নিহিত থাকিবে, তবে তাহার দ্বারা এক শ্রেণীর প্রতি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে, অপর শ্রেণীর প্রতি সে পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল, তাহা প্রচলিত হইল—লোকের রুচি সেইরূপ হইয়া গেল; তাহার পর দেখি যে সর্ব্বনাশ! পূর্ব্বে যাহা চেষ্টা করিলে দু, দশ জনে বাধা দিতে পারা যাইত, এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে হাজার হাজার লোকে সমবেত হইলেও তাহাকে উঠাইতে পারা যায় কি না সন্দেহ। হায় হায়! আমাদের হিন্দু সমাজের এমন দুরবস্থা হইয়াছে যে, যে কার্য্য বাস্তবিক নিন্দনীয় নহে তাহা সমাজের চক্ষে ভয়ানক নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত, আর যাহা বাস্তবিক ভয়ানক নিন্দনীয় তাহা সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় নহে। একজন জমিদার জাল করিয়া অধর্ম্ম করিয়া একজন দুঃখিনী বিধবার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া পথের ভিখারী করিল, সমাজের সাধ্য নাই, ক্ষমতা নাই, সাহস নাই যে সে পাষণ্ড জমিদারকে

সমাজ-চ্যুত করেন ; কিন্তু হয়ত, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান শূদ্র বন্ধুর সহিত ভালবাসায় একত্র আহার করিয়াছে অমনি সমাজ তাহার উপর খড়্গাহস্ত হইলেন, তাহার জাতি গিয়াছে তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। যে সমাজে এইরূপ বিচার তাহাকে রক্ষা করা আর কাহারো সাধ্য নাই।

একটী সংস্কৃত কবিতাতে আছে—

ছেদশ্চন্দন চূত চম্পক বনে রক্ষা চ শাকোটকে,
হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিল-কুলে কাকে চ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর-কার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ।

অর্থ।—যে দেশে চন্দন চূত ও চম্পক বৃক্ষ ছেদন করে কিন্তু সজিনা গাছ রক্ষা করে, সেখানে হংস ময়ূর ও কোকিল হিংসা করে ও কাককে নিত্য আদর করে, যেখানে হস্তী দিয়া গাধা ক্রয় করে, এবং কর্পূর ও কার্পাসের সমান মূল্য দেয়, যে দেশে গুণিদের প্রতি এই বিচার সে দেশের চরণে প্রণাম।"

বাস্তবিক আমাদের সমাজের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে। সত্যবাদী যে হইবে, ধার্ম্মিক যে হইবে, জাতিভেদের বিরুদ্ধ যে হইবে তাহাকে শাসন করিব, আর মিথ্যাবাদী কপট ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত যে হইবে তাহাকে রক্ষা করিব! মানবাত্মার উন্নতি এবং কল্যাণের সহায় না হইয়া সমাজ তাহার বিপরীত হইয়াছে। যে সকল দোষের দিকে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই; অথচ যে সকল বিষয়ে সমাজের দৃক্‌পাত করা আবশ্যক নহে তাহার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। আমি বড় চুল রাখিব, কি টেরি কাটিব, কি

একটি টিকি রাখিব, তাহার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আছে। এ সকল বিষয়ে সকলের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। মানব জীবনের অনেক কার্য্যই ব্যক্তিগত রুচি ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপরে রাখা উচিত। যে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর নাই তাহাতে থাকিয়া মানুষ সুখী হইতে পারে না। যদি এরূপ নিয়ম হয় যে আমি প্রতিদিন যে সকল ব্যঞ্জন আহার করিব তাহা আমার প্রতিবেশীকে দেখাইতে হইবে তবে আমি বাঁচিতে পারি না। প্রত্যেক বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করিলে মানুষকে জড় পদার্থের ন্যায় করিয়া ফেলা হয়।

সমাজে স্বাধীনতা ও সাধুতা এই দুইটি থাকা উচিত। সেই সমাজ সুখী যে সমাজে প্রত্যেক নর নারী স্বাধীন অথচ সাধু। ভগবান যাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন তিনি অবাধে সেই শক্তি অনুসারে তাঁর প্রিয় কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করুন, সমাজ যেন ততক্ষণ হস্তক্ষেপ না করেন, যতক্ষণ তাঁহার দ্বারা কোন অন্যায় না হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের দুর্দ্দশার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নর নারী তাহার হিত-সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতে পারে না। ইহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে কি করা উচিত? ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার অনুগত হইয়া যাহা কিছু সৎ, মহৎ, পবিত্র তাহাই অনুসরণ করিব, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিব।* সমাজ ভাঙ্গিবে বা গড়িবে ইহার কিছুই আমাদিগের ভাবিতে হইবে না। আমরা সমাজ গড়ি নাই, ভাঙ্গিবারও সাধ্য নাই।

* স সেতু র্বিধৃতিরেষাং লোকানা মসম্ভেদায়।

অর্থাৎ। এই সমুদায় রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং সেতু। সমাজ রক্ষার জন্য স্বয়ং ভগবান সেতু স্বরূপ। তিনি মানব মনে যে প্রেম দয়া প্রভৃতি দিয়াছেন তাহা দ্বারাই সমাজ রক্ষা হইবে। তুমি আমি এস কিসে ভাল হওয়া যায় তাহাই চিন্তা করি। সমাজ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবিও না; ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, এ কথা বলো না, কিন্তু ভাল হই, ভাল হই এই কথাই বল।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে ব্রাহ্মগণ কোন সমাজ ভাঙ্গিতে চান না। ভাঙ্গা উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ভাল হওয়া। আমাদের ভাল হইতে গেলে যদি সমাজ ভাঙ্গিয়া যায় তবে আমাদের দোষ কি? মনে করুন কেহ একটি অশ্বথ বৃক্ষ রোপণ করিবার সময় তাহার গোড়াটী ইষ্টক দ্বারা উত্তম রূপে বাঁধাইয়া দিয়া বসিবার জন্য বেদী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তখন একবার ভাবেন নাই যে বৃক্ষটী ও তাহার শিকড়গুলি বাড়িবার স্থান চাই। সে স্থান রাখেন নাই; সুতরাং কিছুকাল পরে দেখেন গাছের শিকড় বাড়িয়া বল পূর্ব্বক সেই বাঁধান স্থানকে একেবারে ফাটাইয়া ফেলিয়াছে। ঠিক এইরূপে নিয়ম ব্যবস্থাদি দ্বারা সমাজকে বাঁধিবার সময়, মানুষের স্বাধীন ভাবে আত্মার স্ফূর্ত্তি পাইবার স্থান যদি না রাখ, কালে মানব মনে স্বাধীনতার ভাব আসিলে সে সমাজ ফাটিয়া যাইবে? আমরা স্বাধীনভাবে বাড়িতে গেলে যদি সমাজ ফাটে, তাহার জন্য দায়ী তাঁহারা যাঁহারা সমাজকে সংকীর্ণ সীমায় বাঁধিয়াছেন।

অতএব নরনারীগণ তোমাদের প্রতি পরামর্শ এই প্রত্যেকে

ন্যায় প্রীতি পবিত্রতার পথ অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছার অনুগত হও। সাধুতায় কি সমাজ ছারখার হইবে? মানুষ সত্যবাদী কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবে আর সমাজ ছারখার হইবে,একি হইতে পারে? সাধুতায় যে সমাজ গঠিত হয় সেই প্রকৃত সমাজ। মিছরির দানা কেমন সুন্দর! যে পরমাণুর যতটুকু বিকাশ হওয়া উচিত তাহা হয়; অথচ ফলে দানাটী সুন্দর হয়। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করে না যে আমি যত টুকু উঠিয়াছি তুমিও ততটুকু উঠ। আর কেহ উঠুক বা না উঠুক তুমিত উঠ—তুমিত ভাল হও। সমাজ মেদীপাতার বেড়া নয় যে একজন এক দিক দিয়া মাথা উচু করিলেই কটিয়া সব সমান করিতে হইবে। প্রত্যেককে ভাল হওয়া চাই তবেই সমাজ ভাল হইবে। সমাজ রক্ষা এবং উন্নতি স্বাধীনতা ও সাধুতা সাপেক্ষ।

ধর্ম্ম কি ?

ধর্ম্ম কি ? ধর্ম্ম কহাকে বলে ?—এই প্রশ্নটী অতি পুরাতন। জগতের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনতম কাল হইতে এই প্রশ্নটী মানবের মনকে আন্দোলিত করিতেছে, অথচ জগতের কোটি কোটি নরনারী এই প্রশ্নটীকে বিস্মৃত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে নানা প্রকার কারণের সমাবেশ হওয়াতে এই প্রশ্নটী লোকের মনে বিশেষ ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ লোকের সংস্কার এই যে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লোকে ধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়াছে; অবিশ্বাস ও সংশয়ে জন সাধারণের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছে; ধর্ম্ম-যাজক ও ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের গৌরব ও প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছে ; চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে কুসংস্কার বোধে পরিত্যাগ করিতেছেন ; এবং ইহা এখন অজ্ঞ লোকদিগেরই নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখ, প্রকৃত ঘটনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম্ম কি ? এই প্রশ্নটী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যেরূপ প্রবল, এরূপ প্রবল আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। জর্ম্মনি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, বিগত শতাব্দীর সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর কেমন প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে পণ্ডিতদিগের

মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক শ্রেণী অর্থাৎ আস্তিকগণ একদিকে যুক্তির প্রতি উদাসীন হইয়া, এবং বিজ্ঞানের আলোকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, প্রাচীন কালাগত সমুদায় কুসংস্কারাপন্ন মত ও বিশ্বাস প্রাণ-পণে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, অপর শ্রেণী অর্থাৎ নাস্তিক ও সংশয়ীগণ প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস সকলকে অজ্ঞতার ফলমাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ প্রকাশ করতঃ ধর্ম্মকেই ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এবিষয়ে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। আর পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকে বালকের উক্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন না। চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে পূর্ব্বে এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। বর্ষে বর্ষে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে, মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ তাহার কত অংশ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ হয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের সপক্ষে, না হয় তাহার বিপক্ষে লিখিত। পূর্ব্বে যে চেষ্টা ছিল না এক্ষণে তাহা দেখা যাইতেছে; ধর্ম্মের কুসংস্কার ভাগ বর্জ্জন করিলে বিশ্বাস-যোগ্য কোন ভিত্তি থাকে কি না, এই গবেষণাতে পণ্ডিতেরা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ধর্ম্মের কুসংস্কার ভাগ বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের নামকে প্রিয়-জ্ঞানে এক প্রকার ভাবে ইহাকে প্রাণে পোষণ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের ত কথাই নাই। এখানে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এখানে বর্ষে

বর্ষে যত প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচারিত হইতেছে তাহার বার আনা ধর্ম্ম-বিষয়ক। ধর্ম্ম প্রচারার্থ কত প্রকার সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, ভারতবর্ষে শিক্ষার গুণে যাহাদের চিন্তাশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা যেন সকলে, ধর্ম্ম কি,—এই একমাত্র প্রশ্নের আলোচনাতেই গভীররূপে নিমগ্ন। সুতরাং ধর্ম্ম কি ?—এই প্রশ্নটী অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ধর্ম্ম কি ? ধর্ম্ম শব্দের অনেক অর্থ। কোন্ অর্থে আমরা ইহাকে গ্রহণ করিতেছি ? প্রথম,বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতিকে ধর্ম্ম বলে। যেমন জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম দাহন ইত্যাদি। আবার শম, দম, ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলীকে ধর্ম্ম বলে ; তৃতীয়তঃ লৌকিক রীতি নীতিকেও ধর্ম্ম বলে, যথা কুলক্রমাগত ধর্ম্ম। সর্ব্বশেষে হিন্দু ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুজনের অবলম্বিত ও মোক্ষসাধনভূত প্রণালী সকলকেও ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত করা যায়। আমরা এই শেষ অর্থে ধর্ম্ম শব্দকে ব্যবহার করিয়াছি ; এবং ইহারই মূল অন্বেষণ করিব।

এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি ? ইহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে কি দেখা যায় ? আমরা প্রথমে দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী ব্যাপার আছে। প্রথমতঃ কতকগুলি মত ও বিশ্বাস, দ্বিতীয়তঃ তদনুযায়ী কতকগুলি অনুষ্ঠান। অর্থাৎ খ্রীষ্টের উপদিষ্ট মত সকল যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাঁহার আদেশানুরূপ অনুষ্ঠান

যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারাই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এই সকল মত ও বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সমষ্টিই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্ম। কিন্তু এইমাত্র আবিষ্কার করিলেই কি, ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া হইল? অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মত ও কতকগুলি অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, এই বলিলেই কি যথেষ্ট হইল? না, কখনই নহে। সূক্ষ্মদর্শী সাধক মাত্রেই এগুলিকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন। এগুলিকে নিকৃষ্ট এই কারণে বলি যে, এগুলি থাকিতে পারে অথচ মানবের সংসারাসক্তি ও পাপাসক্তি বাড়িতেও পারে, মানবহৃদয় ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতেও পারে। ইহার দৃষ্টান্ত কি আবার বিশেষ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে? জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কত শত শত সহস্র সহস্র লোক রহিয়াছে, যাহারা তত্তৎধর্ম্মের উপদিষ্ট সমুদায় মত ও বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে এবং বাহিরে তদুপদিষ্ট সমুদায় অনুষ্ঠানের আচরণ করিয়া থাকে, অথচ তাহারা পুণ্যময় জীবন লাভ করিতে পারে নাই; তাহাদের সংসারাসক্তি হ্রাস হয় নাই, পাপের প্রতি ঘৃণা বাড়ে নাই, পুণ্যের ক্ষুধা প্রবল হয় নাই, এমন কি, এখনও তাহাদের মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরে নাই! আমাদের এই হিন্দু সমাজের কত নরনারীর এই অবস্থা!! বলিতে কি, ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মনে হয় যেন ইহা হংসের ডিম্বের ন্যায়। হংস ডিম্বের উপরকার ত্বক্‌টী দ্বারাও তদন্তরে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ কোষ বা আবরণ দৃষ্টিগোচর হইবে; সেটীকে বিযুক্ত কর

তদন্তরে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হইবে; সেটীর মধ্যে আবার সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ কর তদন্তরে আলোহিত বর্ণ, ঘনীভূত আর একপ্রকার পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারিবে। সেই আলোহিত পদার্থই জীবন্ত বীজকে ধারণ করিতেছে। তন্মধ্যেই যে পদার্থ টুকু আছে তাহারই সর্ব্বাগ্রে নিষেক হইয়াছিল এবং সেই জীবন্ত বীজই মাতৃগর্ব্তস্থ পদার্থপুঞ্জ হইতে সারাংশ আকর্ষণ করিয়া অপর কোষ গুলিকে সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যতক্ষণ সেই প্রাণভূত, সারময়, অন্তস্তম-প্রদেশ-বর্ত্তী পদার্থ বিদ্যমান ও সতেজ রহিয়াছে, ততক্ষণ ডিম্বটীর কোষ সকল স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। সেই প্রাণভূত অন্তস্তম পদার্থকে বিনষ্ট কর, ডিম্ব পচিয়া গেল! যে কোষ সজীব ও সতেজ ছিল, তাহা পূতিগন্ধময় এবং অস্পৃশ্য হইয়া পড়িল। তেমনি ধর্ম্মের প্রাণভূত সারভূত একটী পদার্থ আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মত ও বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার অভাবে এ সকল পূতিগন্ধময় গলিত বস্তুর মধ্যে গণ্য। ধর্ম্মের একটী মূল ভাব আছে, একটী চরম ও সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া মত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল উৎপন্ন হইয়াছে। শিশু যেমন অপরিস্ফুট ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে যায়, এক কথা ভাবে আর এক কথা বাহির হইয়া পড়ে; কতক অপরিস্ফুট ভাষায়, কতক হস্ত পদ গ্রীবাদি সঞ্চালনের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে যায়, অথচ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না; সেইরূপ যে গভীর ভক্তি, যে অনির্ব্বচনীয় তৃষ্ণা, যে

হৃদয়ান্দোলনকারী উন্মাদক আকাঙ্ক্ষা, মানব সৃষ্টির আদি কাল হইতে মানবপ্রাণকে বিলোড়িত করিতেছে, তাহাই সাধকগণ, প্রেমিকগণ ও ভাবুকগণ যুগে যুগে ভাষায় ও কার্য্যে প্রকাশ করিতে গিয়া ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবতারণা করিয়াছেন। যেমন একই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন শিশুর মুখে বিভিন্ন ভাষাতে প্রকাশিত হয়, তেমনি একই ধর্ম্মভাব ভিন্ন ভিন্ন সাধকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। এইভাবে সকল ধর্ম্মের একতা; সকলেরই একটী সামঞ্জস্যের স্থান আছে; সকলের মধ্যে এক সূত্র আছে, যদ্দ্বারা সকলকে গ্রথিত করা যায়। এই কারণেই বলি ধর্ম্মের প্রাণভূত সেই বস্তুটীই সার। মত মতান্তর ও অনুষ্ঠানাদি বাহিরের ব্যাপার। শাস্ত্রেও এই প্রকার ভাবের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে পতিব্রতোপাখ্যান নামে একটী উপাখ্যান আছে, তাহাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একজন ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষার্থী হইয়া একজন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহস্থের পত্নী তখন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গৃহকার্য্য সারিয়া যেমন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে আসিতেছেন, অমনি তাঁহার পতি মহাশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিলেন। রমণী আর ভিক্ষা দিবার সময় পাইলেন না। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তালবৃন্ত হস্তে পতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে কুপিত হইয়া বলিলেন—

"ব্রাহ্মণা ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃকৃতঃ।
গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে॥"

ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ হইল না, পতিই শ্রেষ্ঠ হইল। তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মপালন কর অথচ ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা কর।

ইহাতে পতিপ্রাণা উত্তর করিলেন ;—

"নতু তত্ত্বেন ভগবন্ ধর্ম্মং বেৎসীতি মে মতিঃ।"

"হে ভগবন্ আপনি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানেন না, এই আমার অনুমান।" সেই নারী আরও বলিলেন—

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ নহিংসেত তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শুচিঃ।
কাম-ক্রোধৌ বশে যস্য তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

পতিব্রতা যেন বলিলেন—দেখে দেও ঠাকুর তোমার ধর্ম্মের আদেশ। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিম্বা যজ্ঞোপবীত থাকিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না—'ক্রোধ মানবের শরীরস্থ শত্রু, এই ক্রোধ এবং মোহকে যিনি পরিহার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন; যে ব্যক্তি সত্যবাদী, যিনি গুরুশুশ্রূষাতে তৎপর, যিনি অপকৃত হইয়াও অপকার করেন না, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন; যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি ধর্ম্মানুরাগী, যিনি স্বাধ্যায়-

নিরত ও শুচি, কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন ; যে ধর্ম্মজ্ঞ ও মনস্বী ব্যক্তি সকল জীবকে আত্মসম করিয়া দেখেন, এবং যিনি সকল প্রকার ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।" এই সকল বচনের উদ্দেশ্য এই যে, প্রচলিত ধর্ম্ম মতে বিশ্বাস থাকিলেই এবং প্রচলিত অনুষ্ঠান করিলেই কেহ ধার্ম্মিক হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম চরিত্রের বস্তু। সুতরাং এতদ্দ্বারা মত মতান্তর ও বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষা চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করা হইতেছে।

আপনারা হয়ত অসহিষ্ণু হইয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবে ধর্ম্ম কি ? ধর্ম্মের সারভাগ কি ? আসুন একবার দেখা যাউক সাধুগণ এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছেন। মহাত্মা যীশুকে তাঁহার শিষ্যগণ একবার ঠিক্ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। শিষ্যগণ বলিলেন—"গুরো ! ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা কি ?" যীশু বলিলেন, "তোমাদের পিতা পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন ও সমুদায় শক্তির সহিত প্রীতি কর।" শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আরও সার কথা কিছু আছে কি না ? যীশু বলিলেন; "তোমার প্রতিবেশীকে তুমি আপনার ন্যায় প্রীতি কর ;" বলিয়া বলিলেন "এই দুই সত্যই—অর্থাৎ ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব—সকল ধর্ম্মের সার ; ইহাতেই সকল শাস্ত্রের আদেশ উপদেশ এবং সকল ধার্ম্মিক সাধু সজ্জন আলম্বিত হইয়া রহিয়াছে।" ধর্ম্মের সার ভাগ কি, জিজ্ঞাসা করাতে মহাত্মা চৈতন্য বলিয়াছিলেন "জীবে দয়া নামে ভক্তি"—এই ধর্ম্মের সার ; ইহাও সেই ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব।

এখানে আবার এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই উভয় ভাবের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান? কোন্‌টী মূলীভূত? এ দুইটী স্বতন্ত্র ভাব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন মাত্রায় এ দুইটীকে সাধিত হইতে দেখা গিয়াছে। এমন ধর্ম্ম-জীবন দেখিয়াছি এবং অনুসন্ধান করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যাহাতে ঈশ্বর-ভক্তি সুন্দররূপে বিকশিত কিন্তু মনুষ্য-প্রেম তদনুরূপ বিকশিত নয়। এই শ্রেণীর সাধকগণ মনুষ্য সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া ভজন সাধন করিতে ভালবাসেন, নির্জ্জন অরণ্যে বা জন-সঙ্গম-বিবর্জ্জিত গিরি-কন্দরে বসিয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে মনোনিবেশ করিয়া অধিক সুখ পান। জগতের সুখ দুঃখ বা ভদ্রাভদ্রের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। জগতের পাপ তাপ, জীবসমূহের বিবিধ দুর্গতি, অগণ্য প্রজাকুলের নানাপ্রকার যাতনা এ সকলে ইহাঁদের চিত্তকে অধিক উত্তেজিত করে না। ইহাঁদের ধর্ম্ম ভক্তি-প্রধান ধর্ম্ম। আবার আর এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মজগতে আছেন যাঁহাদের ধর্ম্ম নীতি-প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহারা জগতের দুঃখের ভার লঘু করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র; সেই চেষ্টাতে সর্ব্বদা রত। মানবে মানবে সম্বন্ধজনিত যে সমুদায় নীতির নিয়ম, তাহার প্রতি ইহাঁদের প্রগাঢ় আস্থা। তাহা ভঙ্গ করিলে ইহাঁরা কখনই ক্ষমা করিতে পারেন না। নীতির পবিত্রতার দিকে ইহাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, জগতের পাপ তাপের প্রতি ইহাঁদের কখনই ঔদাসীন্য নাই, তাঁহারা সেই সকল দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই একান্ত অন্তরে যত্ন করিতেছেন। যাঁহারা ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের পথাবলম্বী, তাঁহারা ঈশ্বর-ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেছেন; যাঁহারা নীতি-প্রধান ধর্ম্মাবলম্বী,

তাঁহারা নীতি ও চরিত্রকে ও মনুষ্য-প্রেমকে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রধান ও কোন্‌টী মূলীভূত ?

ঈশ্বর-ভক্তি ও মনুষ্য-প্রেম এই উভয় বিষয়ে যাঁহারা অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন, এবং ইহার যুক্তিও অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর-ভক্তিই মূল, মনুষ্য-প্রেম তাহার শাখামাত্র। একটী হইতে আর একটী স্বতঃই উৎপন্ন হয়। মনুষ্য-প্রেমকে ছাড়িয়া ঈশ্বর-ভক্তি যেমন আংশিক ও অসম্পূর্ণ, তেমনি ঈশ্বর-ভক্তি ছাড়িয়া মনুষ্য-প্রেমও আংশিক ও অসম্পূর্ণ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তি মনুষ্য-প্রেমকে উৎপন্ন করিবেই করিবে। যদি ভক্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু মনুষ্য-প্রেম না থাকে, তবে তাহা অস্বাভাবিক বস্তু, তাহা আত্মার সুস্থ ভাবের চিহ্ন নহে। সে যাহা হউক, ধার্ম্মিকদিগের এবং সাধক ভক্তদিগের অধিকাংশই এক বাক্যে এই কথা বলিতেছেন যে, ঈশ্বরভক্তি ও মনুষ্য-প্রেম মধ্যে প্রথমটীই প্রধান এবং তাহাই ধর্ম্মের প্রাণ।

আমরা কি প্রশ্নের চরম সীমার মধ্যে উপনীত হইয়াছি ? ইহার আরও মূলে অন্বেষণ করিবার কি কিছুই নাই ? ঈশ্বর-ভক্তি কাহাকে বলে ? তাহার মূলে আবার কোন্ কোন্ ভাব আছে, এবং সেই সকল ভাবের মধ্যে আবার কোন্‌টী প্রধান ? এরূপ প্রশ্ন সকল কি উদয় হইতে পারে না ? পারে বৈ কি ? এই সকল প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, আমরা আবার তর্কারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি।

এই যে ঈশ্বর-গত ভাব, যাহাকে ঈশ্বর-ভক্তি নাম দিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহার প্রকৃতি কি? এই সম্বন্ধে আবার পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবাত্মার যত প্রকার ভাবের উদয় হয়, সে সমুদায়কে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া মধুর ভাবকে অর্থাৎ পতি-পত্নী ভাবকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। যে ভাব হৃদয়ে থাকিলে বিচ্ছেদে অসুখ ও সম্মিলনে সুখ, সেই প্রেমভাবকে তাঁহারা ধর্ম্মভাবের সারভূত ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন, ধর্ম্মভাবের মূলে নির্ভরের ভাব (sense of dependence)। আমি ক্ষুদ্র ও পরিমিত, আমি আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি না, আমি তবে কাহার উপর নির্ভর করি, এই নির্ভরের ভাব হইতেই ঈশ্বরের ভাব মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, এবং এই নির্ভরের ভাবই ধর্ম্ম-ভাবের প্রাণ।

সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের মূলীভূত ভাব বিস্ময় (wonder)। ঈশ্বর অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় হইলেও এই বিস্ময়ের ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং ভবিষ্যতে মানবের ধর্ম্মভাব তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে। স্পেন্সরের লিখিত একটী প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেনঃ—

"From the very beginning the progress of knowledge

has been accompanied by an increasing capacity for *wonder.*"

এবং পরে

"Hereafter, as heretofore, higher faculty and deeper insight will raise rather than lower this sentiment."

উক্ত উভয় বাক্যের অর্থ—আদিমকাল হইতেই মানবের জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ের শক্তি বাড়িয়াছে।

পুনশ্চ

"যেমন ভূত কালে তেমনি ভবিষ্যতে যতই জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধি হইবে, এবং যতই সূক্ষ্ম দর্শনের শক্তি জন্মিবে, ততই এই ভাবটীর হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।"

য়িহুদী ধর্ম্মে বলে ধর্ম্ম-ভাবের মূলভাব ভয়। সর্ব্বশক্তি-মান, পাপের শাস্তিদাতা ঈশ্বর উদ্যত বজ্রের ন্যায় সর্ব্বদা রহিয়াছেন, এই ভয় হইতেই ধর্ম্ম জীবনের স্ফুর্ত্তি আরম্ভ হয়।

এইরূপে ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মজীবনের মূল কোথায়, ইহা অন্বেষণ করিতে গিয়া কেহ বলেন—প্রেম, কেহ বলেন নির্ভর, কেহ বলেন বিস্ময়, কেহ বলেন ভয়। কিন্তু প্রকৃত ভাব কি? আমি যেন দেখিতেছি, এই সমুদায় ভাব কাচের কলমে প্রতিফলিত সূর্য্য-রশ্মির ন্যায়। সূর্য্য-রশ্মিতে নীল, পীত, লোহিত, পাটল, ধূমল প্রভৃতি সকল বর্ণেরই সমাবেশ; কিন্তু কাচ খণ্ডে সেই রশ্মি যখন প্রতিফলিত হয়, তখন এক-দিক দিয়া দেখিলে নীল বর্ণ দেখিতে পাই, আর এক দিক দিয়া দেখিলে পীত বর্ণ দেখিতে পাই। সেইরূপ সেই পবিত্র

পুরুষের সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সকল ভাবেরই সমাবেশ। কিন্তু অবস্থা বিশেষে কোন ভক্তের প্রাণে একটী ভাব দেখা গিয়াছে, আর এক অবস্থাতে আর একটী ভক্তের প্রাণে আর এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব কেবল প্রেম বা কেবল নির্ভর বা কেবল বিস্ময় বা কেবল ভয় বলিলে চলিবে না, এমন একটী গূঢ় ভাব আবিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে প্রেম, ভয়, নির্ভর, বিস্ময় সকলের সমন্বয় ও সমাধান হইতে পারে। তাহা কি, একবার দেখা যাউক।

আপনারা একবার স্থির চিত্তে মুদিত নয়নে ক্ষণকাল নিজ নিজ জীবনের বিষয় চিন্তা করুন, কিম্বা কল্পনা করুন, একজন বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য যে কখনও নিজ জীবনের বিষয় চিন্তা করে নাই, সে সবে আত্মদৃষ্টির দ্বারা নিজ জীবনের বিষয় চিন্তা ও বিচার করিতেছে। ঐ ব্যক্তি নিজ জীবনের বিষয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া কি কি সত্য আবিষ্কার করিয়াছে? চারিটী তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে। প্রথম তত্ত্ব এই আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার ইচ্ছা ও তাহার শক্তি সম-ব্যাপী নহে; অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা যতদূর যায় তাহার শক্তি ততদূর যায় না। ইহা আমরাও চিন্তা করিলে দেখিতে পাই। আমরা এ জীবনে এত অসুখী কেন? আমাদের শক্তি আমাদের ইচ্ছার অনুসারী নয় বলিয়া। তাই কি নয়? যদি ইচ্ছামাত্র মনের সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কি জীবনে এত অসুখের কারণ থাকিত? তবে কে আমাদের

শক্তিকে ইচ্ছার অনুসরণ করিতে দিতেছে না? যদি আমি স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র হই, যদি আমার নিয়ামক কেহ না থাকে, যদি আমার উপরে কার্য্য করিবার কোন শক্তি না থাকে, তবে এ কে, যে আমার শক্তিকে নিয়মিত করিয়া প্রতিনিয়ত আমাকে আমার দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে? এই গভীর প্রশ্নে ঐ আত্ম-চিন্তা-পরায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে।

সে আর একটী মহা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। সে দেখিতে পাইয়াছে, তাহার শক্তি যে কেবল তাহার ইচ্ছানুসারী নয়, তাহা নহে। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাহার ইচ্ছা পদে পদে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ যেন সদর্পে তাহার ইচ্ছাকে চূর্ণ করিতেছে। আমরাও কি ইহা দেখিতে পাইতেছি না? আমরা কি! কিসের অহঙ্কার করি! আমরা পঞ্চভূতের ক্রীড়া-পুত্তলীপ্রায়! প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহই আমাদিগের মান সম্ভ্রম রাখিতেছে না। বায়ু আমাদিগকে পদাঘাত করিয়া ভূশায়িত করিতেছে, সাগর তরঙ্গ অট্ট হাস্য করিয়া আমাদিগকে বেলাভূমিতে আছড়াইতেছে।

তৃতীয় তত্ত্ব এই,—আমরা যাহাকে জীবন বলি, এই সাধের মানব জীবন, যাহার প্রতি এত মায়া, যাহার জন্য এত দুষ্কর্ম্ম, এই জীবন আমার ইচ্ছাতে পাই নাই। ইহার আদি আমার নিকট প্রচ্ছন্ন এবং তদুপরি আমার হস্ত ছিল না। আমি ইচ্ছা দ্বারা পাই নাই, অন্য কেহ যেন দেহাধারে এই জীবন স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে। সেইরূপ ইহার অন্তও আমার নিকট প্রচ্ছন্ন এবং তদুপরি আমার হস্ত নাই। আমি ইচ্ছার

দ্বারা এই বায়ু-পিত্ত-কফময় দেহে, এই সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদময় সংসারে এ জীবনকে নিত্য কাল রক্ষা করিতে পারি না। আমি যদি স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র, তবে কেন আমার জীবন আমার আয়ত্তাধীন হইল না ?

চতুর্থ তত্ত্ব এই, যে যে ক্রিয়ার উপর আমার জীবন অব্যবহিতভাবে নির্ভর করে সেই সকল ক্রিয়া আমার ইচ্ছাধীন নয়। আমি ইচ্ছা না করিলে হাত খানি উঠিবে না, কিম্বা পা খানি চলিবে না,কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য, পাকস্থলীর কার্য্য, রক্তের গতিবিধি প্রভৃতি জীবনরক্ষণের পক্ষে অব্যবহিতভাবে আবশ্যক যে সকল ক্রিয়া, তাহার কোনটী আমার ইচ্ছাধীন নহে। শ্বাস আমার হুকুমের অপেক্ষা করে না, রক্ত আমার অনুমতির জন্য বিলম্ব করে না। এ কি ! আমি যদি স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র তবে আমার জীবনের স্থিতি,আমার ইচ্ছাধীন নহে কেন ?

তবে ভাই এই চারিটী তত্ত্ব একবার এক সঙ্গে মিলাইয়া দেখ। দেখ দেখি কোন্ তত্ত্বে গিয়া উপনীত হও। তুমি দেখিতেছ (১ম) যে কোন এক কারণে তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে তোমার শক্তিতে কুলাইতেছে না ; (২য়) কোন এক কারণে তোমার ইচ্ছাকে পদে পদে চূর্ণ করিয়া দিতেছে। (৩য়) কোন এক কারণে তোমারই নিজের জীবনের আদি অন্তের উপর তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, (৪র্থ) কোন এক কারণে তোমার জীবন রক্ষার উপযোগী অত্যাবশ্যক ক্রিয়া সকলের উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব নাই। অর্থাৎ তুমি নিরন্তর বুঝিতেছ যে তুমি স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র নও, তুমি তোমার জীবনদাতা ও জীবনের আশ্রয় নও। তবে কে ?

এস এখন এই প্রশ্নের ভিতর প্রবিষ্ট হই। পূর্ব্বোক্ত চারিটী সত্য তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তুমি একমাত্র শক্তি নও, তোমা ভিন্ন অন্য শক্তি আছে। এই শক্তি এক কি বহুসংখ্যক? বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই ইহা দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে সকল শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া দেখিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন শক্তি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া মনে হইতেছে। তাপ, গতি, আলোক প্রভৃতি এককালে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, এখন সপ্রমাণ হইতেছে ইহারা একই শক্তি। এইরূপে সকল শক্তিই পরিণামে একের দিকে যাইতেছে। অতএব এই শক্তি এক। এবং ইহা নিত্য, কারণ বহুল অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই শক্তি অবিনশ্বর। ইহা আকারান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, দশ স্থান হইতে এক স্থানে আসে মাত্র; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড-শক্তির এক অণুও বিনষ্ট হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবর্ত্তিনী অনন্ত ও নিত্য মহাশক্তিই আমাদের জীবনদাত্রী ও জীবনের আশ্রয়-ভূতা। এই মহাশক্তির আভাস পাইয়াই হার্বার্ট স্পেন্সার সাহসের সহিত বলিয়াছেন;—

"But amid the mysteries, which become the more mysterious, the more they are thought about, there will remain the *one absolute certainty that he* (man) *is ever in the presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed.*"

অর্থ—"বিশ্বের এই সকল দুরবগাহ্য সমস্যার মধ্যে (যতই চিন্তা করা যায় ততই এই দুরবগাহ্যতার বৃদ্ধি হয়) একটী সুনিশ্চিত তত্ত্ব এই থাকিবে যে, মানবের সন্নিকটে একটী অনন্ত ও নিত্যকাল-স্থায়িনী মহাশক্তি বিদ্যমান, যে শক্তি হইতে সমুদায় প্রসূত হইয়াছে।" স্পেন্‌সার ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনেক ব্যূহ ভেদ করিয়া গিয়া অবশেষে এই মহাশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু স্পেন্‌সার এই মহাশক্তিকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না; এবং এই শক্তি-রাজ্যের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন ;—"হে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী, জীবনদাত্রী মহাশক্তি তুমি কি ?" "সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।" ইহাই স্পেন্‌সারের মতে ধর্ম্ম ভাবের সার, ইহাই উপাসনা।

কিন্তু অপেক্ষা কর, দেখা যাউক এই শক্তির প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু জানি কি না? দেখা যাউক, এই শক্তির লক্ষ্য কি? এবং সেই লক্ষ্য সিদ্ধির প্রণালী কি? আমরা কি এই শক্তির লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না? তাহা কেমন করিয়া বলিব? এই শক্তির লক্ষ্য উন্নতি অর্থাৎ শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, সমতা ও সামঞ্জস্য স্থাপন। জড় জগতের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কোটি কোটি যুগ ধরিয়া তরল উষ্ণ বাষ্পরাশি হইতে এই ধনধান্যপূর্ণা সৌন্দর্য্যশালিনী পৃথিবী, ওই সুধাময় পূর্ণচন্দ্র, ওই প্রখর রশ্মিশালী সূর্য্য, ওই দীপ্তিময়ী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী বিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই বহু-যুগ-ব্যাপী বিবর্ত্তন প্রক্রিয়াকে একবার

এক দৃষ্টিতে দর্শন করিবার চেষ্টা কর। কি দেখিতেছ? প্রকৃতির অন্তরালবর্ত্তিনী মহাশক্তি ভাঙ্গিতেছেন কি গড়িতেছেন? এই কি সত্য নয় যে, গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন না? যেখানে ভাঙ্গিতেছেন তাহাও গড়িবার জন্য। এই দিগন্তব্যাপী ও বহুযুগব্যাপী বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে কি শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, সমতা ও সামঞ্জস্য স্থাপন দেখিতেছ না? না বলিবার উপায় নাই, ইহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত কথা। তবে এই মহা শক্তি সম্বন্ধে আর একটু অধিক কথা এই জান যে, উন্নতিই এই শক্তির লক্ষ্য। অতঃপর এই শক্তির কার্য্য প্রণালীর বিষয় অনুধ্যান কর, ইহার কার্য্য প্রণালীর মধ্যেও কিঞ্চিৎ ভাব দেখিতে পাইবে। (১ম) লক্ষ্যের আশ্চর্য্য স্থিরতা (fixity of aim); (২) উপায়ের অমোঘতা (infallibility of means); (৩) প্রতিকুলাচরণে শাস্তি (punishment for violation)। এই শক্তি কি দুর্জ্জয়, কি সুনিশ্চিত, কি অধ্যবসায়শীল যে কেহই ইহাকে ইহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে পারে না! লোকাতীত বলের সহিত ইহা লক্ষ্যের দিকে গমন করে, শীঘ্রই হউক বা পরেই হউক, লক্ষ্য সিদ্ধি করিবেই করিবে। দ্বিতীয়তঃ চমৎকার দেখ যে, লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে উপায়টী অবলম্বিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত উপায়, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়; তদুপরি উৎকৃষ্টতর উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না; এবং এই শক্তিকে কখন নিজের ভ্রম সংশোধন করিতে দেখা গেল না। তৃতীয় এই শক্তির পথ যদি রোধ কর তোমারই ক্ষতি ইহার ক্ষতি নাই। তোমাকে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

জড়জগতের রক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এই সকল নিয়ম দেখা যাইতেছে। আত্মার জগতে কি এ সকল নিয়ম নাই? যে শক্তি জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য কৌশলে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, আত্মার জগতে কি সে শক্তির কোন কার্য্য নাই? ইহা কোন্ অযৌক্তিক কথা! তাহা কি সম্ভব হইতে পারে? আত্মার জগতেও উন্নতি এই শক্তির লক্ষ্য। সেখানেও শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, সমতা, ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা ইহায় লক্ষ্য।

আত্মার জগতে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য, ও সমতা স্থাপন করা কাহাকে বলে? গূঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখ, মানব ইতিহাসে মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখ, সমগ্রভাবে কোন একটী সুসভ্য জাতির উন্নতির ক্রম লক্ষ্য করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া অনিবার্য্য বলের সহিত সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতাকে স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। সর্ব্বত্রই দেখ অসত্যের উপর সত্যের মাহাত্ম্য, অপ্রেমের উপর প্রেমের মাহাত্ম্য এবং অন্যায়ের উপর ন্যায়ের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। যে সকল সামাজিক বিধি অপ্রেম বা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার ভিত্তিদেশ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে; ভূমিকম্পের ন্যায় সমাজ-কম্প অনুভূত হইতেছে; চিরদিনের প্রপীড়িত প্রজাকুল সিংহগর্জ্জনে গগন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া অত্যাচারী রাজকুলের গ্রীবাদেশ আক্রমণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে; দিন দিন অনুদার সঙ্কীর্ণ, পক্ষপাতী, ও পীড়ক আইন সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সর্ব্ব সাধারণের সত্ব ও অধিকার স্থাপিত

হইতেছে। এ সকল সমাজবিপ্লব দেখিয়া কেমন করিয়া বলিবে, এই মহাশক্তি আত্মার জগতে কিছু করিতেছে না! যে শক্তি জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যরূপিণী সেই শক্তি মানবমনে ধর্ম্মরূপিণী, ইহা কি স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যাইতেছে না?

এই শক্তি নিরন্তর ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণা করিতেছে। আমরা যে পরিমাণে সেই প্রেরণার অনুগত হই, অর্থাৎ যে পরিমাণে স্বার্থ ও অহঙ্কারকে খর্ব্ব করিয়া নিজ প্রবৃত্তি সকলের উপরে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার জয় স্থাপন করিতে দিই, সেই পরিমাণে আমাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব; এবং যে পরিমাণে আমরা এই প্রেরণাকে অবহেলা করি, সেই পরিমাণে আমরা নিকৃষ্ট, সেই পরিমাণে আমরা হীন। এই মহাশক্তির অনুগত হওয়াতেই আমাদের শোভা, ইহার বিরুদ্ধাচারণে আমাদের কদর্য্যতা। মার্কিন পণ্ডিত Emerson এক স্থানে এই মহাসত্যটী সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার Over-soul নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন:—

"What we commonly call man, the eating, drinking, planting, counting man, does not, as we know him, represent himself, but misrepresents himself. Him we do not respect, but the soul, whose organ he is, would he let it appear through his action, would make our knees bend. When it breathes through his intellect it is *genius*; when it breathes through his will it is *virtue*, when it flows through his affection it is *love*. And the blindness of the intellect begins when it would be something of itself. The weakness of the will begins when

the individual would be something of himself. All reform aims, in some one particular, to let the soul have its way through us; in other words to engage us to obey."

অর্থঃ—"আমরা সচরাচর যাহাকে মানুষ বলি, যে মানুষ আহার করে, পান করে, কৃষি কার্য্য করে, কেরানিগিরি করে, এ মানুষ দেখিলে প্রকৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং সে পরিচয়ের ব্যাঘাত হয়। সে মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি না, কিন্তু সেই আত্মা (পরমাত্মা) মানুষ যাঁহার যন্ত্রস্বরূপ, যদি মানুষ তাঁহাকে নিজ কার্য্যে প্রকাশ হইতে দেয়, তবে তাঁহার নিকট আমাদের মস্তক অবনত হয়। এই মহান্ আত্মা যখন মানবের বুদ্ধি দ্বারা প্রবাহিত হয়, তখন সে বুদ্ধি প্রতিভার আকার ধারণ করে; যখন ইচ্ছাতে অধিষ্ঠান করে তখন সাধুতা প্রকাশ পায়; যখন হৃদয়কে আশ্রয় করে তখন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। যখন আমাদের বুদ্ধি স্বতঃই একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইতে চায়, তখন আমাদের বুদ্ধির অন্ধতা উপস্থিত হয়; যখন মানুষ নিজে একটা কিছু হইতে চেষ্টা করে, তখনই মানব ইচ্ছার দুর্ব্বলতা আরম্ভ হয়। সকল প্রকার সংস্কারের একই উদ্দেশ্য আমাদের মধ্য দিয়া সেই মহান্ আত্মাকে প্রবাহিত করা, অর্থাৎ আমাদিগকে তাঁহার অনুগত করা।"

বাস্তবিক ইহা অমূল্য সত্য এবং এই সত্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যে পরিমাণে এই পবিত্র পুরুষের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার যোগ হয়, সেই পরিমাণেই আমরা মানব জীবনের গূঢ় সৌন্দর্য্য ও রহস্য অনুভব করিতে পারি।

ইহার সহিত আমাদের যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণই আমরা মহৎ, ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন কর, অমনি মানবের মহত্ত্ব লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়। যেমন কোন বড় লোকের পত্নী স্বীয় পতিকে বলিতে পারেন "আমি যে তোমার স্ত্রী এই জন্যই আমার গৌরব। নতুবা আমি গরিবের মেয়ে আমাকে কে চিনিত, কে গণিত? তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলে আমি দেশের লক্ষ লক্ষ গরিবের মেয়ের মধ্যে একজন থাকিতাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে তাহাতেই আমি বাড়িলাম।" আমরা সেইরূপ এই পবিত্র পুরুষকে বলিতে পারি—"হে নাথ, আমি যে তোমাকে জানিতে ও তোমার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি, ইহাই আমার মহত্ত্ব। তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ না থাকিলে আমি কি? আমি পঞ্চভূতের খেলার পুতুল মাত্র। তুমি যে আমাকে প্রেমের অধিকার দিয়াছ, ইহাতেই আমি বড় হইয়াছি।"

তবে ধর্ম্মের সার তত্ত্ব এতক্ষণের পর পাইলাম। যে পরম পুরুষ জড়জগতে শক্তিরূপে বাস করিয়া বিবিধ বস্তু সৃজন করিতেছেন, যিনি আত্মার অন্তরে শক্তিরূপে বাস করিয়া পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস নয়নে সত্য বলিয়া দর্শন করা ও তাঁহার অনুগত হওয়াই ধর্ম। উপনিষদ বলিতেছেন :—

"যশ্চায় মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ যশ্চায় মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

অর্থ—"এই যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই যে তেজোময় অমৃতময়

সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাকে জানিয়া এবং ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে। যাইবার অন্ত পথ আর নাই।" ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম আর নাই পথও আর নাই।

ধর্ম্মের যত প্রকার বাহিরের আবরণ থাকুক না কেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের যতই আড়ম্বর হউক না কেন, সে সমুদায়ের মধ্যে সার বস্তু এই টুকু। যদি এই বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে অপর সমুদায় ব্যাপার পূতিগন্ধময় দ্রব্য হইয়া যায়। মানবের প্রতি প্রেম ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ এই মহাশক্তির অনুগত হইলে মানবাত্মাতে প্রেমের বল প্রকাশিত হয়;—হৃদয় মানবের সুখ দুঃখের দিকে স্বতঃই প্রধাবিত হয়; গর্ব্ব স্বতঃই চূর্ণ হয়; এবং জীবন এক নব শক্তি দ্বারা গঠিত হইয়া এক নবভাব ধারণ করে।

ধর্ম্মের এই টুকু সার শস্য, আর সমুদায় খোসা, আর সমুদায় অসার দ্রব্য মাত্র। অনেকে অনেক প্রকার অসার বস্তুকে ধর্ম্ম বলিয়া সেবা করিতেছেন। কেহ অতি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সকল লইয়া বিবাদ করিয়া জীবন কাটাইতেছেন; কেহ কুলক্রমাগত আচার ব্যবহারকে একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞানে সেবা করিতেছেন; কেহ অন্ধপ্রায় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসরণ করিতেছেন। ধর্ম্মের যাহা প্রাণ, ধর্ম্মভাবের মধ্যে যাহা সার, তাহার দিকে হয়ত তাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই। কেবল সারগ্রাহী, সূক্ষ্মদর্শী ও প্রেমিক ব্যক্তিরাই ধর্ম্মের সার শস্য সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কাল যেন স্রোতের ন্যায়। এই কালস্রোতে' সাধুগণ এক এক মুষ্টি তুষমিশ্রিত সত্যের কণা ফেলিয়া দিয়াছেন। খোসা বা তুষগুলি স্রোতের উপরে উপরে ভাসিয়া স্রোতের অগ্রে অগ্রে ছুটিতেছে; শস্যগুলি গভীর জলে নিমগ্ন থাকিয়া অতি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। চুনা পুঁটি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সকল মহানন্দে কোলাহল করিয়া সেই উপরি ভাসমান তুষরাশি আহার করিতেছে। কিন্তু রোহিত কাতাল প্রভৃতি বড় বড় মৎস্য দুই চারিটী গভীর জলে নিমগ্ন থাকিয়া সার শস্য সঞ্চয় করিতেছে। এইরূপ দেখ ধর্ম্ম রাজ্যের চুনা পুঁটি-রাই ধর্ম্মের বাহিরের ব্যাপার, উপরকার কথা লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। সারগ্রাহী প্রেমিকের সংখ্যা অধিক নহে; তাঁহারা গভীর জলে নিমগ্ন।

পূর্ব্বে ধর্ম্মের যে লক্ষণ দেওয়া হইল, তাহাতে একটী সত্য সকলেই অনুভব করিতেছেন। সেটী এই, ধর্ম্ম সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে। বিশ্বাস চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবর্ত্তী পুরুষকে সত্য বলিয়া না ধরিলে ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভই হয় না। সত্য বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরূপ তর্কও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের মনের সাধু প্রবৃত্তি সকলের উন্নতির জন্য উপাসনা আবশ্যক। ঈশ্বর কিংস্বরূপ আমরা জানি না, অতএব একটী কল্পিত মূর্ত্তি সমীপে রাখিয়া উপাসনা করিলে, উপাসকের সাহায্য হইতে পারে। কি ঘৃণিত কথা! কি অর্ব্বাচীনের কথা! কি অসার স্থূলদর্শী লোকের কথা! কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া কি কখনও সত্য ভাবের উদয় হইতে পারে? ভাবে কর, আমার বাড়ীর মধ্যে

দুইটী ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ কল্পনা করিয়া যেরূপ কাহারও সত্য ত্রাসের সঞ্চার হয় না; মনে কর আমি শত্রু সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছি, ইহা ভাবিয়া যেমন কাহারও প্রকৃত সাহসের উদয় হয় না; দাবা খেলাতে নৌকা, অশ্ব, গজ, রথী, পদাতিক লইয়া যুদ্ধ করিয়া যেমন কেহ বীর সেনাপতি হয় না; নিজের হস্তে কোন সুন্দরীকে চিত্রিত করিয়া সেই ছবির সহিত যেমন কেহ প্রণয়ে আসক্ত হয় না; সেইরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না।

শাস্ত্রে আছে—

"মনসা কল্পিতামূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন সুখিনো মানবাস্তদা ॥"

"মনে মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা যদি মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্য লাভ করিয়া লোকে প্রকৃত সুখী হইতে পারে।" ধর্ম্ম কল্পনাকে ঘৃণা করে, সত্য লইয়াই ইহার কারবার; বিশ্বাস লইয়াই ইহার জীবন। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর আত্ম-প্রতারিত লোক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধি-শক্তির গুণে প্রাচীন পৌত্তলিকতার ও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া কলাপের বিজ্ঞান-সম্মত তাৎপর্য্য অনুভব ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নিজের বিদ্যা বুদ্ধিকে মনে মনে গৌরব করিয়া ভাবিতেছেন যে, প্রাচীন কালের পিতৃ-পুরুষগণ সেই ভাবেই সেই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। দুর্গামূর্ত্তি একটী জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় সত্যের প্রকাশমাত্র, কালীমূর্ত্তি কালের প্রতিকৃতিমাত্র; রামায়ণ একটী সুন্দর রূপক

মাত্র ইত্যাদি। কিন্তু এই স্থূলবুদ্ধি লোকেরা একবার বিবেচনা করিতেছেন না যে, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট যাহা স্থিরতর বিশ্বাসের বস্তু ছিল, যাহা সত্যভাবে পূর্ণ ছিল, তাঁহারা সে সমুদয় রূপক ও কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রাচীন ধর্ম্মের শত্রু কে? ধর্ম্ম রূপককে কি কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া থাকে না, ইহা সত্যের আশ্রয় চায়। কল্পনার আবির্ভাব মাত্র ধর্ম্মের অন্তর্ধান হয়।

এইরূপ কেহ কেহ ধর্ম্মের লক্ষণ দিতে বলিলে "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়াং" প্রভৃতি দশটী কি আটাশটী গুণের উল্লেখ করেন। ২৮টী কেন ৪৮টী গুণের উল্লেখ করিলেও তাহা ধর্ম্মের লক্ষণ নয়। ধর্ম্ম সেই জিনিষ যাহা ভিতরে থাকিলে এ গুলি বাহিরে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়। এগুলি ফুল ধর্ম্ম রস; এগুলি বাহিরের ক্রিয়া, ধর্ম্ম প্রাণ। এগুলিকে যিনি ধর্ম্ম বলিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই জানেন না, তিনি স্থূলদর্শী ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ধর্ম্মের এই সত্যভাব, এই মহৎ ভাব, এই গূঢ় ভাব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে কোন প্রকার নিকৃষ্ট লক্ষ্যের সাধনস্বরূপ মনে করেন না।

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম পারলৌকিক সুখের জন্য। ইহা প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট অতি নিকৃষ্ট কথা। ইহা বণিকবৃত্তি; বণিক যেমন কিছু পাইয়া কিছু দেয় ইহাও সেইরূপ। আমরা যে এই পবিত্র পুরুষের অনুগত হইবার ইচ্ছা করি, তাহা কি পারলৌকিক সুখের আশায়? ছি! সে সুখের কথা মনেও থাকে না। তাঁহার অনুগত হইতে যাই কেন? তাঁহাকে

ভালবাসি বলিয়া। ভালবাসি কেন? ভালবাসার পদার্থ বলিয়া। পূর্ণিমার চন্দ্রের কেন প্রশংসা করি? উত্তরকালের সুখের আশায় নয়, কিন্তু সুন্দর দেখি বলিয়া। কেহ মনে করিতে পারেন, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা লোকস্থিতি রক্ষার জন্য। একটা ধর্ম্ম খাড়া না করিলে সমাজ রক্ষা হয় না, এই কারণে। ইহাও নিকৃষ্ট কথা। ইহাঁদের মতে, যদি সমাজ রক্ষার অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তবে আর ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেহ কেহ মনে করেন, এদেশ দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন; ইহাও কাঁচা কথা। যদি কেহ বলেন যে, ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক সুখের জন্য, অন্তরের তৃপ্তির জন্য, তাহা হইলেও স্থূল কথা বলা হয়। ইহা কিরূপ কথা? যদি কেহ বলে, আমি স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসি সুখের জন্য, তাহা হইলে যেরূপ কথা হয়, ইহাও সেইরূপ কথা। ভালবাসি বলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া সুখী হই, যে ভালবাসে না সে দেখিয়া সুখী না হইয়া বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে। ধর্ম্ম সাধন করি কেন? ধর্ম্ম মিষ্ট কেন? ধর্ম্ম প্রাণের প্রিয় বস্তু কেন? এই সকল প্রশ্নের এক উত্তর এই, পরম পুরুষকে ভালবাসি বলিয়া। লাভ লোকসানের হিসাব ইহার মধ্যে নাই; ইহ পরকালের বিচার ইহার মধ্যে নাই; বিষয় বাণিজ্যের ব্যাপার ইহার মধ্যে নাই; দেনা পাওনার গণনা ইহার মধ্যে নাই।

পরিশেষে উপসংহার করা যাউক। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম তাহার সার নিষ্কর্ষ করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই এক আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে

বাস করিয়া জড়ের শক্তি সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, এবং মানব হৃদয়ে বাস করিয়া পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এই শক্তিরই প্রভাবে জড়জগতে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, সমতা ও সামঞ্জস্য বিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং নিরন্তর হইতেছে—ইহারই প্রভাবে মানব-হৃদয়ে ও মানব-সমাজের মধ্যে বিবিধ বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জড়ের অন্তরালে আমরা ইহাঁকে দুর্জ্জয় বলরূপে দেখিতে পাই, মানবাত্মাতে আমরা ইহাঁকে ধর্ম্মভাবের প্রেরকরূপে সাক্ষাৎভাবে লক্ষ্য করি। জড়ে ইনি শক্তি, মানব প্রাণে ইনি পুরুষ। এই পরম পুরুষের আভাস মাত্র প্রাণে অনুভব করিয়া, মানব-হৃদয়ে যে গভীর আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে, তাহাই মানব বার বার বিবিধ প্রকারে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সেই চেষ্টাতেই ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের সৃষ্টি ; ইহাতেই বেদের মন্ত্র সকলের উৎপত্তি ; ইহাতেই স্তুতি বন্দনা প্রার্থনাদির প্রকাশ, ইহাতেই ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যুদয়। চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে, সেইরূপ এই পরম পুরুষ আভাস মাত্র আপনাকে দেখাইয়া যুগে যুগে মানব প্রাণকে টানিয়াছেন। মানব সেই ভাবে উন্মত্ত প্রায় হইয়া হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, ছুটিয়াছে, ভাবিয়াছে, খাটিয়াছে, মরিয়াছে এবং যে রাজ্য হইতে এই হৃদয়-প্রফুল্লকর, আশাপ্রদ, সুস্নিগ্ধ জ্যোতির একটী কিরণ আসিল, সেই রাজ্যের আরও সংবাদ পাইবার আশায় ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছে। অমনি মানব মুখে "দেখা দেও নাথ" এই প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই বিবেক ও বৈরাগ্য দেখা দিয়াছে। সংসারের অনিত্য ছায়াময় সুখকে

অসার জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া মানব এই সারাৎসার ও পরাৎপরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। এইরূপে সেই পরম পুরুষের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে তৎপর হওয়াতে বিশ্বাস গাঢ়তর হইয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছে। এই বিশ্বাস ও প্রেমের ভাব একবার গাঢ় হইলে দুর্ব্বলতার সময় নির্ভর,শক্তি দেখিয়া বিস্ময়, পাপের অবস্থায় ভয় প্রভৃতি সকল ভাবই আপনাপনি প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

প্রেমের স্বধর্ম্ম এই যে,ইহা ইচ্ছাকে অধিকার করে, ইচ্ছাকে ইচ্ছার অনুগত করে। বিশ্বাস ও প্রেমের গাঢ়তা জন্মিলেই মানব ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের ইচ্ছার অনুগত হইয়া থাকে। হৃদয় সকল প্রকার বন্ধন মুক্ত হইয়া সত্যের পথে, প্রেমের পথে ও পবিত্রতার পথে নীত হয়; এবং এই সকল মহৎভাবই আত্মার অন্নপান ও প্রাণ স্বরূপ হয়। মৎস্যের পক্ষে জল যেমন, প্রেমিক আত্মার পক্ষে সাধুতা সেইরূপ। ইহাঁর হৃদয় বিশ্বাসের অটলভূমির উপর দণ্ডায়মান। ইহাঁর সাধুতা ক্ষতি লাভ গণনার ফল নয়। জগতের সমগ্র লোক একদিকে হইলেও ইহাঁকে সত্য, ন্যায় বা পবিত্রতার ভূমি হইতে বিচলিত করিতে পারে না; কিম্বা এই প্রেমিকের মুখকে মলিন করিতে পারে না; কারণ তিনি এই জানিয়া সুস্থির আছেন যে,ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবর্ত্তী সেই পরম শক্তি সাধুতার সহায়। এই বিশ্বাস ও আনুগত্যই ধর্ম্ম; এবং ইহার দ্বারাই আমরা সেই পবিত্র পুরুষের সহবাসের অধিকারী হই।

এই ব্রহ্ম সহবাসের সুখ একবার অনুভব করিলে আর পাপ পুণ্য বিচার দুষ্কর থাকে না। যাহাতে মানবকে এই সহবাসে

সমর্থ করে, তাহা পুণ্য ; যাহাতে মানবকে সেই সহবাসের অনুপযুক্ত করে, তাহা পাপ। ধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠভাব গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের বাহিরের ব্যাপার সকলকে তুলনায় হীন বলিয়া মনে হয়। সাধুরা এই মহৎভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা প্রণালীবদ্ধ করিতে গিয়াছেন, অমনি মত মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে ; কার্য্যের দ্বারা প্রণালীবদ্ধ করিতে গিয়াছেন, অমনি বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই সকল মত ও অনুষ্ঠান সেই সকল সাধু মহাজনের ও উঁহাদের শিষ্য পরম্পরার বুদ্ধির ভ্রম প্রমাদ সম্বলিত হইয়া নানা প্রকার অসত্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে ; তাঁহাদের বিশেষ মতের ছায়া পাইয়া বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপে একই আকাঙ্ক্ষা একই মূলভাব হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে।

সারগ্রাহী লোকে ধর্ম্মের সার ভাগেরই প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন এবং এই প্রেম ও আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার প্রয়াস পান। ধর্ম্মকে তাঁহারা কোন প্রকার ক্ষুদ্র লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় মনে করেন না। কিন্তু ইহার গভীর সত্যভাবের মধ্যে মন প্রাণকে নিমগ্ন করিয়া তন্ময় হইয়া যান। সকল প্রকার কল্পনাকে ইহাঁরা ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁরা ধর্ম্মকে গঠন করেন না, কিন্তু ধর্ম্মই ইহাঁদিগকে গঠন করেন। মানব-হৃদয় যতদিন এইরূপে ধর্ম্মভাবদ্বারা অধিকৃত, পরাজিত ও গঠিত না হয়, ততদিন ধর্ম্মের মর্ম্ম, ধর্ম্মের প্রভাব ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য কেহ অনুভব করিতে পারে না। ততদিন সে নিতান্ত অজ্ঞ লোকের ন্যায় নীতি স্থূল কথা ও বাহিরের কথা বলিতে

থাকে। সে সকল কথা শুনিয়া ধর্ম্মের রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে মনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না।

ধর্ম্মের এই সার ভাব গ্রহণ করিবার চেষ্টা কর; বিশ্বাস-নয়নে এই ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষকে সত্যরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা কর; প্রেমের দ্বারা ইহাঁকে হৃদয়ের নিভৃতস্থানে অর্চ্চনা করিতে অভ্যাস কর; ইহাঁর পবিত্র ইচ্ছার অনুগত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষাবান্ হও; যে কোন কার্য্যে ইহাঁ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে, ইহাঁর সহবাসের অনুপযুক্ত করে, তাহাকে বিষ-জ্ঞানে পরিহার কর; সত্য, ন্যায় ও প্রেমের মহিমা নিজ প্রাণে মহীয়ান্ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াসী হও; একান্ত অন্তরে নিরন্তর নিজ প্রবৃত্তি সকলের উপর জয়লাভের জন্য সংগ্রাম কর; দেখিবে এই পবিত্র পুরুষ আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিবেন; দেখিবে মেঘজাল তিরোহিত হইবে; দেখিবে নবজীবনের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে; আকাঙ্ক্ষা পবিত্র-তার দিকে উড্ডীন হইবে; প্রবৃত্তি নীচ পথ পরিত্যাগ করিবে; বিশ্বাস সত্যের ভূমি আশ্রয় করিবে; এবং পবিত্রতা জীবনের অন্ন পান হইবে। ইহাই ধর্ম্মের অবস্থা, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ।

ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ ?

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে যে এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি বিদ্যমান, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের সমুদায় সত্য যাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বরূপকে যাঁহারা মানবের অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মহাশক্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের *Nineteenth Century* নামক মাসিক পত্রিকাতে হার্বার্ট স্পেন্সার এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উপসংহারে জগতের আদি কারণকে এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

"*An Infinite and Eternal Energy from which every* thing proceeds."

"অর্থ—জগত মধ্যে এক অনন্ত ও অবিনাশী শক্তি আছে, যাহা হইতে চরাচর বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে।" জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রণীত Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেনঃ—

"It would seem then that, in the only sense in which experience supports in any shape the doctrine of a First Cause—viz, as the primœval and universal element in all causes, the First Cause can be no other than Force"—Mill's Essay on Theism.

অর্থ।—"কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে এবং কারণ শব্দের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, অর্থাৎ সমুদায় কারণের আদি ও সর্ব্বব্যাপী কারণ রূপে যাহা বিদ্যমান, সেই অর্থে, শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলিতে পারা যায় না।"

উক্ত উভয় পণ্ডিতের মতেই এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহাও নহে, এই আদ্যাশক্তি, এক, অনন্ত ও অবিনাশী। প্রথম প্রশ্ন এই— এই শক্তি যে এক, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিল, এই ব্রহ্মাণ্ড দুই বা তদধিক শক্তির সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় নাই? ইহার উত্তর জন ষ্টুয়ার্ট মিল উক্ত গ্রন্থে দিয়াছেন:—

"The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which is never increased or diminished."

অর্থ।—"এই শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন, এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আছে; যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।"

এই শক্তি এক ও অক্ষয় এবং ইহা হইতেই বিশ্বের সকল কার্য্য হইতেছে, সুতরাং ইহা সর্ব্বব্যাপী। তবে এই মহা পণ্ডিতেরাও মানিতেছেন যে বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান, যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অবিনাশী ও অনন্ত।

কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতি কি? মিলের কথার ভাবে বোধ হয় তিনি এই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জড়শক্তি বলিয়া অনুভব করেন; যেমন তাড়িত বা ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি বটে, কিন্তু অন্ধ জড়শক্তি মাত্র, সেইরূপ এই আদি শক্তিও অন্ধ জড়শক্তি

মাত্র। স্পেনসার বলেন, এই শক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয়। অথচ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত মাসিক পত্রিকার পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবচৈতন্যেও এই শক্তির প্রকাশ—"it wells up in consciousness"—"এই শক্তি মানবের চিৎশক্তি মধ্যে উৎসারিত হইতেছে।" আরও একস্থানে বলিয়াছেন—"Something more than consciousness" অর্থাৎ চিৎশক্তি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এই শক্তি তাহা অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উন্নত।

এখন একবার বিচার করিতে হইবে যে, এই আদ্যাশক্তির বিষয়ে সত্তার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পারা যায় কি না? স্পেনসারের যে উক্তিটী সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, চরাচর বিশ্ব এই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই মহাশক্তি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তিল হইতে যেমন তৈল নিঃসৃত হয়, জল হইতে যেরূপ বাষ্প নিঃসৃত হয়, সেইরূপ জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তিত স্বরূপ মাত্র। এখন প্রশ্ন এই, মানবের চিৎশক্তি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মানবাত্মা কি আশ্চর্য্য বস্তু! কি গভীর প্রহেলিকা! এই অদ্ভুত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন চৈতন্য কোথা হইতে সৃষ্টিরাজ্যে দেখা দিল? আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই জগতের অবস্থা এককালে উষ্ণ বাষ্পাকার ছিল এবং তখন সেই উষ্ণ বাষ্পরাশির মধ্যে মানবচৈতন্য দূরে থাকুক, কোন প্রকার জীবাঙ্কুরেরও থাকা সম্ভব ছিল না! পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের এক স্থলে মিল বলিয়াছেন :—"There is a vast amount

of evidence that the state of our planet was once such as to be incompatible with animal life, and that human life is of "very much more modern origin than animal life"—Essay or Theism

অর্থ। "ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থা এককালে এমন ছিল যে, ইহা কোন জীবের জীবন রক্ষার উপযোগী ছিল না, এবং মানব জীবন অপর জীবনের অনেক পরে উদ্ভূত হইয়াছে।"

Encyclopedia Britannica নামক গ্রন্থে সুবিখ্যাত Huxley হাক্সলি সাহেব (Biology) অর্থাৎ জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার একস্থানে বলিয়াছেন ;—

"The condition of the globe was at one time such, that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state."—

অর্থ। পৃথিবীর অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, তখন কোন জীবিত প্রাণীর ইহাতে বাস করা অসম্ভব ছিল; কারণ বাষ্পাবস্থায় ইহা কোন প্রকার জীবের স্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।"

তবেই দেখা যাইতেছে, এই ধরণী এক কালে তরল উষ্ণ বাষ্পময় ও জীবন ধারণের অনুপযোগী ছিল; তখন ইহাতে বিচিত্র শক্তিশালী মানবাত্মা দূরে থাকুক, জীবের জীবনও ছিল না। ধরাধামে জীবন ছিল না, জীবন আসিয়াছে; কোথা হইতে আসিয়াছে? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর। প্রথম—জীবন জড়েরই পরিণতি মাত্র; দ্বিতীয় উত্তর—ইহা কোন

চেতনময় পুরুষ হইতে সংক্রান্ত। দেখা যাউক প্রথম উত্তরটী কতদূর যুক্তিযুক্ত, ইহা সপ্রমাণ হয় কি না? যদি বলা হয় জড় হইতেই জীবনের উৎপত্তি, তাহা হইলে এই বলা হইল, অচেতন শক্তি চেতনকে প্রসব করিয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে হাক্সলি (Huxley) বলিয়াছেন;—

"The properties of living matter distinguish it absolutely from all other things; and the *present state of knowledge furnishes us with no link between the living and the not-living.*

অর্থ।—"সজীব পদার্থের গুণাবলী তাহাকে অপর সমুদায় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র প্রকার করিয়াছে; আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থাতে, কিরূপে যে জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইল, তাহা আমরা জানি না।"

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন;—

"Of the causes which have led to the origination of living matter, it may be said, that we know absolutely nothing."

অর্থ।—কি প্রণালীতে এ জগতে সজীব প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে আমরা কিছুই জানি না।"

তবুও যদি আপনারা বলেন যে জড় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে বিবর্ত্তবাদের একটী মূল নিয়ম স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেটী আমাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে। নিয়মটী এই; কার্য্যের গুণাবলী

কারণের গুণাবলীর অনুসারী হইয়া থাকে। মনে করুন, জল, তেজ, প্রভৃতি পদার্থের সমবায়ে বাষ্পের উৎপত্তি হইয়াছে। বাষ্পে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সকলে কোন না কোন আকারে বিদ্যমান ছিল না। এই যুক্তির অনুসারে একজন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, চৈতন্য যদি কোন আকারে সেই আদিশক্তিতে বিদ্যমান ছিল না, তবে কোথা হইতে সৃষ্টি মধ্যে আবির্ভূত হইল? জনষ্টুয়াট্ মিল ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে অতি কদর্য্য মৃত্তিকা হইতে যেমন চমৎকার উদ্ভিদ ও পুষ্পাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্থূল জড় হইতে সূক্ষ্ম চেতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে বিচিত্র কি? ফুল মৃত্তিকার পরিণত রূপ; কিন্তু কোথায় কদর্য্য মৃত্তিকা আর কোথায় নির্ম্মল ফুল! সেইরূপ জড় হইতে বিসদৃশ পদার্থ যে চেতন, তাহা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বলাতে দোষ কি? মিল মহাশয়ের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে আমাদিগকে নিরুত্তর করিতে পারিতেছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব, ফুলের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পরম্পরার মধ্যে অবস্থিত ছিল না? পুষ্পের নয়ন-তৃপ্তিকর বর্ণ সূর্য্য-রশ্মিতে ছিল, কোমলতা জলীয় পরমাণুতে বিদ্যমান ছিল, সুগন্ধ পৃথিবীতে ছিল। সেইরূপ কি এই কথা বলিবে যে, মানবাত্মার চিৎশক্তি সেই আদি কারণ ভূত মহাশক্তি মধ্যে বর্ত্তমান ছিল? কেহ কেহ বলিবেন যে, কার্য্যের গুণ যে সকল স্থানেই কারণের গুণানুসারী হয়, তাহা নহে। চুণ ও হরিদ্রা এই উভয়ের কেহই লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট নহে, অথচ উভয়ের সংযোগে রক্ত বর্ণের আবি-

র্ভাব হয়। অথবা দশ খানি দ্রব্য মিলাইয়া ঔষধ প্রস্তুত হইল; তাহাদের কোন একটীর পিত্তঘ্নতা নাই কিন্তু দশখানি মিলিত হইলে পিত্তঘ্নতা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যেমন দেখিতেছি যে, কার্য্যে এমন গুণের আবির্ভাব হইতেছে যাহা কারণীভূত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না; সেইরূপ কেন বল না যে, চৈতন্য এই দেহের নিদানভূত ধাতু সকলের মধ্যে কোন একটীতে ব্যষ্টিভাবে না থাকিলেও সমষ্টিভাবে তাহাদের সংযোগ-সিদ্ধ দেহ-পিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা উপমা মাত্র হইল; প্রমাণ হইল না। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা এই মাত্র বলা হইল যে, যে প্রণালীতে চূণ হরিদ্রার সংযোগে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হয় তদনুরূপ কোন প্রণালীতে জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ইহাকে প্রমাণ বলে না। মনে কর, যে ব্যক্তি সেই লোহিত বর্ণ পদার্থটী দেখিয়া বলিতেছে যে, ইহা চুণ ও হরিদ্রার সংযোগে সমুৎপন্ন, সে তাহা নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে পারে। (১ম) সেই সংযোগজাত পদার্থটীকে রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া চুণ ও হরিদ্রা স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারে (২) সে চুণ ও হরিদ্রাকে মিশ্রিত করিয়া সেই যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারে (৩) সে চুণ ও হরিদ্রা উভয়ের মধ্যে এমন গুণ সকল আবিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারে, যাহার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণ হইবার কথা। যিনি বলিতেছেন যে, জড় হইতেই চৈতন্যের আবির্ভাব, তাঁহার নিকটে আমরা এরূপ কোন প্রমাণ চাই; কারণ যে মাত্র তিনি বলিলেন যে, ইহাতে জড়ের অতিরিক্ত কিছু নাই, তদ্দণ্ডেই তাঁহার

উপর আমাদের এই দাওয়া জন্মিল যে আমরা তাঁহার নিকট অপর জড় পদার্থের পরীক্ষার প্রমাণের ন্যায় প্রমাণ চাহিব। সেরূপ প্রমাণ না দিতে পারিলে তাঁহার উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি হয় জড়কে অবলম্বন করিয়া চেতন উৎপন্ন করুন; (২য়) না হয় চেতনকে বিশ্লেষণ করিয়া জড়কে প্রদর্শন করুন (৩) না হয় রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে বলিয়া দিন, দেহের কোন ধাতুকে কি কি পরিমাণে সংযুক্ত করিলে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে। ইহার কোন প্রমাণ তিনি যদি দিতে না পারেন, তবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি, দম্ভ-পূর্ব্বক একথা প্রচার না করিয়া হাক্সলির ন্যায় বিনয়ের সহিত বলুন;—"কিরূপে জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব হইল, তাহার কিছুই জানি না; তবে বোধ হয় যে প্রণালীতে চূর্ণ হরিদ্রার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন প্রণালীতে হইয়া থাকিবে।" "ভবিতব্যতার অনেক দ্বার; এইরূপ হইতে পারে, আর এক প্রকারও হইতে পারে" এরূপ হইলেও হইতে পারে" এ প্রকার মনের ভাবকে প্রমাণ কহে না। অতএব জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি—একথা অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই।

আর যদিও বা স্বীকার করা যায় যে, কার্য্যগুণ কারণগুণ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, তথাপি আর এক যুক্তি দ্বারা জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। ঐ যুক্তিটী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধের সমালোচনাস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিটী তাঁহারই ভাষাতে দেওয়া গেল;—

"কার্য্যের গুণ কারণের গুণ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের সত্তা কারণের সত্তা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। মনে কর চূণ এবং হরিদ্রা এই দুই বস্তু মিলিয়া মিশিয়া একটি লোহিত বর্ণ দ্রব্যে পরিণত হইল; মিশ্র বস্তুটির সেই যে লোহিত বর্ণ তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইটি মূল-বস্তুর দুইটি বর্ণ হইতে ভিন্ন—তাহা তৃতীয় একটি বর্ণ; কিন্তু ঐ দুই মূল বস্তুর যে দুই সত্তা, তাহার অতিরিক্ত কোন সত্তাই মিশ্র বস্তুটিতে থাকিতে পারে না,—তৃতীয় বর্ণের ন্যায় তৃতীয় সত্তা থাকিতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের গুণ যদিও এমন হইতে পারে যাহা কারণে নাই, কিন্তু তা' বলিয়া কার্য্যের সত্তা এমন হইতে পারে না—যাহা কারণে নাই। এই যুক্তিতে পাওয়া যায় যে, মূল কারণে যদি চেতন-পদার্থের সত্তা না থাকিত, তবে জগতে তাহা কোন প্রকারেই আসিতে পারিত না। এখানে এইটি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক যে, চেতন-পদার্থের সত্তা এবং জড় পদার্থের সত্তা দুয়ের মধ্যে একটি মূলগত প্রভেদ আছে; সে প্রভেদ এই যে, চেতন পদার্থের সত্তা তাহার আপনার জন্য—চেতন পদার্থ আপনি আপনার সত্তা অনুভব করে,—জড়-পদার্থের সত্তা পরের জন্য—চেতন-পদার্থই জড়-পদার্থের সত্তা অনুভব করে; এক কথায়—চেতন-সত্তা আত্মার্থিকী, জড়-সত্তা পরার্থিকী; চেতন-সত্তা এবং জড়-সত্তার মধ্যে এইরূপ এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর উত্থাপিত রহিয়াছে। এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের সহজেই মীমাংসা হইতে পারে, যথা,—কার্য্যেতে যখন এমন কোন সত্তাই থাকিতে পারে না যাহা কারণেতে নাই, তখন ইহা মানিতেই হইবে যে, মূল কারণে চেতন-সত্তা বিদ্যমান

থাকাতেই জগতে চেতন সত্তা আবির্ভূত হইতে পারিতেছে। আর এক কথা এই যে, মনে কর যে জগতের কোথাও কোন একটিও জীব নাই, তাহা হইলে জড়ের যত কিছু গুণ আছে সমস্তই গতি ও সংহতি (Solidity) এই দুই গুণে পর্য্যবসিত হয়, জড়-বস্তুর ঐ দুইটি গুণ ভিন্ন তাহাতে আর যে কোন গুণ লক্ষিত হয়, সমস্তই জীবের অস্তিত্ব সাপেক্ষ;—কামানের বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে সেই বারুদের পরমাণুগণের মধ্যে যে এক প্রকার গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই কেবল জীবের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে না—তাহাই বিশুদ্ধরূপে জড়-গুণ, কিন্তু তদ্ভিন্ন শব্দাদি আর যে কোন গুণ আবির্ভূত হয় সমস্তই জীবের অস্তিত্ব-সাপেক্ষ;—জগতের কোথাও যদি কোন জীব বর্ত্তমান না থাকে, তবে "শব্দ" বলিয়া একটা আবির্ভাব জগতের কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে এইটি প্রমাণ হইতেছে যে, চূণে হলুদে মিশ্রিত হইলে তদুৎপন্ন বস্তুটিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা মুখ্য-রূপে কেবল গতির পরিবর্ত্তন; চূণের আণব (Molecular) গতির সহিত হলুদের আণব গতি মিলিত হইয়া তৃতীয় এক প্রকার আণব গতি উৎপাদন করে,—অর্থাৎ বায়ুর বেগ এবং স্রোতের বেগ মিলিত হইয়া নৌকাতে যেমন তৃতীয় এক প্রকার বেগ উৎপাদন করে,—সেইরূপ। জীব একটি সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেই উক্ত মিশ্র বস্তুটির ঐ আণব গতি জীবের প্রাণে কার্য্য করিয়া তাহার চক্ষে রক্তবর্ণরূপী একটি অবভাস উৎপন্ন করে। সুতরাং ঐ যে অবভাস, উহা জীবাশ্রিত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে,

জড়-বস্তু হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাতে এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে, জড়-বস্তু হইতে জীবও উৎপন্ন হয়; কেননা জীব আগে আছে—তাই তাহাকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি উৎপন্ন হয়, এরূপ নহে যে, আগে শব্দাদি উৎপন্ন হয়—তাহার পরে জীব উৎপন্ন হয়। এক দিকে জীব আর এক দিকে জড়—শব্দাদি গুণ সমূহ দুয়ের মধ্যস্থলে; শব্দাদি গুণ সমূহ জড়-বস্তুর যত নিকটবর্ত্তী, জীব তাহা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী;—জড়-বস্তু যখন জীবের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই নিকটবর্ত্তী গুণগুলিই স্বতঃ উৎপাদন করিতে পারে না, তখন দূরবর্ত্তী জীব উৎপাদন করা তাহার পক্ষে কত যে দূরে হাত বাড়ানো—কত যে অনধিকার চর্চ্চা—কত যে অসাধ্য ব্যাপার—তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই পারেন।"

জড় হইতে চেতন একথা যদি প্রমাণিত হইল না, তখন চেতন হইতে চেতন একথাই অধিক বিশ্বাস্য; কারণ কার্য্য-গুণ কারণগুণের অনুসারী হয়। এতদ্দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করা যায় সেই আদ্যা শক্তি চিন্ময়ী। এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্য-বর্ত্তিনী শক্তি চিন্ময়ী, ইহার অর্থ এই যে এই সৃষ্টি যেরূপেই উৎপন্ন হউক না কেন, সজ্ঞানে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এই পরা-শক্তির জ্ঞানের অন্তর্গত ছিল। আরও বহুতর প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, এই বিশ্বের অন্তরালে যিনিই থাকুন, চিৎশক্তি ও জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার ধর্ম্ম। উপনিষদ কহিয়াছেন;—

"পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ"। "ইহাঁর শক্তি মহৎ ও বিচিত্র এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বাভাবিক।"

শিশুর স্তনপানরূপ ক্রিয়াটীর বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। এই ক্রিয়াটী কেমন আশ্চর্য্য!!! এতদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে; অথচ সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই। কিরূপে সে ক্রিয়াটী সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ নাই; অথচ সুচারুরূপে সেই ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইতেছে। এই ক্রিয়াটী অন্যান্য ক্রিয়া হইতে কিরূপ বিভিন্ন! শিশুর জ্ঞান নাই, অভ্যাস নাই, শিক্ষা নাই, উপদেশ নাই, অথচ এমন একটী ক্রিয়া করিতেছে, যদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, সেই উদ্দেশ্য-জ্ঞান ও সেই মঙ্গল অভিসন্ধি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই মহাশক্তিতেই আছে? মানব-শিশুতে যেমন জ্ঞান নাই, অথচ আশ্চর্য্য জ্ঞান-ক্রিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পশু পক্ষীর ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিলেও এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এমন সকল কার্য্য করে, যাহার তাৎপর্য্য তাহারা জানে না, এবং কোন বুদ্ধিমান জীব করিলে তাহার আশ্চর্য্য উদ্ভাবিনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, অথচ তন্মূলে তাহাদের বিচার-শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষিদিগের কুলায়-নির্ম্মাণ, মধুমক্ষিকার মধু-সঞ্চয়, বোলতা প্রভৃতির খাদ্যাহরণ কার্য্য এই শ্রেণী গণ্য। ভেকদিগের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়ার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভেককে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় মস্তক বিহীন শরীরার্দ্ধ যখন পড়িয়া আছে, তখন তাহার

একখানি পায়ে যদি এক বিন্দু এসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তখনি আর একখানি পা দিয়া সেই এসিড্ বিন্দু মুছিবার জন্য বার বার প্রয়াস পাইতে থাকে। এই ক্রিয়ার প্রকৃতি কি আশ্চর্য্য!! এ কার্য্যে যে তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখানেও দেখিতেছি, অজ্ঞতা সহকারে এমন একটি কার্য্য হইতেছে, যাহার মধ্যে একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ কি বলিবেন? যে জ্ঞান ভেকে নাই অথচ কার্য্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান কোথায়? শুনুন, এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ্জ মিভার্ট এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন;—বিগত এপ্রিল মাসের Fortnightly Review পত্রিকাতে তিনি লিখিয়াছেন:— "For myself I am bound humbly to confess that more *I study nature, the more I am convinced that in* the action of this all-pervading but inscrutable and unimaginable intelligence, of which self-conscious human rationality is the utterly inadequate image attainable by us, is to be sought the possible explanation of the mysterious but undeniable presence in Nature of a rationality in that which is in itself irrational."

অর্থ—"আমার কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার নিকট আমি বিনয় সহকারে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমি যতই প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে, যে, সেই সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় পরম জ্ঞানকে—আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন মানবীয় জ্ঞান

যাহার ছায়ামাত্র—(অথচ এই মানব জ্ঞান ভিন্ন সে জ্ঞানের অন্য প্রতিকৃতি আমাদের পাইবার উপায় নাই)—স্বীকার করা ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে বিচার-বিহীন ও জ্ঞান-বিবর্জ্জিত প্রাণীতে জ্ঞান-ক্রিয়া দর্শনরূপ অত্যাশ্চর্য্য সমস্যার সদুত্তর হইবার উপায়ান্তর নাই।"

সেই আদ্যা শক্তি যে জ্ঞানশালিনী, আর একটী যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়—তাহা সৃষ্টিকৌশল দর্শনে স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয়। সুবিখ্যাত ডারুইন সাহেবের Fertilization of Orchids নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন। সে ঘটনাটী এই;—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্য পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে, পুষ্পের গঠনের এমন চাতুরী আছে যে, তাহারা সহসা মধুপান করিতে পারে না, মধুর নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ভ-রেণুর সহিত মিশিয়া যায়।' মধুপানে যে বিলম্ব হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া ডারুইন বলিয়াছেন;—"If this is accidental, it is a fortunate accident for the plant. If this be not accidental, *and I cannot believe it to be accidental,* what a singular case of adaptation!"

অর্থ। "এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল তবে ইহা এমন আকস্মিক ঘটনা যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে!"

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন ;—

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge, the adaptations in Nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

অর্থ।—"আমার বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া, ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, জ্ঞানদ্বারাই এই সৃষ্টি হইয়াছে।"

বিশ্বের আদি কারণে যে কেবল জ্ঞান আছে তাহা নহে, তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছাও আছে। ইহার প্রথম যুক্তি এই যে, আমাদের আত্ম-নিহিত ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন শক্তির জ্ঞান আমাদের নাই। এ বিষয়ে একটী প্রশ্ন আছে; আমরা জগতের কার্য্য-পরম্পরা দেখিয়া যে শক্তির অনুমান করিতেছি, সে শক্তি-জ্ঞানের মূল কোথায়? যদি কোন স্থানে কার্য্যের পশ্চাতে, গতির অন্তরালে, চেষ্টার প্রারম্ভে শক্তিকে বিদ্যমান না দেখিয়া থাকি, তবে আর এক স্থলে কার্য্য বা গতিকে দেখিয়া শক্তির চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইবে কেন? তাহা কি স্বাভাবিক? মনে কর; এক ব্যক্তি জীবনের মধ্যে একটী দিনও অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখে নাই, সে কি এক দিন পর্ব্বত-পৃষ্ঠে হঠাৎ ধূমের সঞ্চার দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে পারে? পর্ব্বতে ধূম আছে, অতএব বহ্নিও আছে, ইহা যে ব্যক্তি বলিতেছে

সে জানে ধূম বহ্নি হইতেই নির্গত হয় ; অর্থাৎ ধূমের পশ্চাতে বহ্নি থাকে। সেইরূপ যে ব্যক্তি কখনও দেখে নাই যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি হয়, সে কি ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনারাজি দেখিয়া শক্তির অনুমান করিতে পারে? তবেই এক ব্যক্তি যখন এই বিশ্বের কার্য্য সকল দেখিয়া বলিতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই এক মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন, সে সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেছে যে, সে নিজে শক্তি হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছে। সে কোথায় ইহা দেখিল? এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তির প্রথম পরিচয় আমাদের অন্তরে। আমরা যখন অঙ্গ সঞ্চালন করি, যখন কোন দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করি, তখন আমরা কোন জাতীয় শক্তির পরিচয় পাই? আমরা হস্ত দ্বারা একটী ভারি বস্তু স্থানান্তরে রাখিয়াছি, এখানে সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক কে? হস্তের মাংসপেশী সমুদায় অথবা তদন্তরালবর্ত্তী আর কোনও শক্তি? এমন অবিবেচক কে আছে যে বলিবে যে, মাংসপেশী সকল সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। সেখানে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের ইচ্ছাই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। সেই ইচ্ছারূপিণী শক্তিই হস্তকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের শক্তি-জ্ঞানের মূল এইখানে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে শক্তির অনুমান করিতেছি, তাহা এই শক্তিজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। স্পেনসারও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত First Principles নামক গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন ;—

"No force save that, of which we are conscious during our own muscular efforts is immediately known to us" while "all other force is mediately known."

অর্থ।—"আমাদের অঙ্গচালনাকালে আমরা যে শক্তি অনুভব করি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের নাই, এতদ্ভিন্ন যে কোন শক্তির জ্ঞান আছে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে কিন্তু অনুমানলব্ধ জ্ঞান মাত্র।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমরা যাহাকে শক্তি বলি, তাহার মূলে মানসিক বলেরই জ্ঞান। সুতরাং "ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান" এই সত্য উচ্চারণ করিলে আমরা যদি তাহা মনে ধারণ করিতে যাই, তাহা হইলে সেই শক্তিকে ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বলরূপে ধারণা করিতে পারি না। অতএব যে যুক্তি আমাদিগকে এই মহাশক্তির সত্তাতে উপনীত করে, সেই যুক্তিই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, এই শক্তি মানসিক শক্তি অর্থাৎ ক্রিয়েচ্ছা বা (will)।

দ্বিতীয় যুক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, আমাদিগের শারীরিক ক্রিয়া গুলির বিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেই মানবদেহে চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। (১ম) ইচ্ছা-প্রসূত ক্রিয়া, (২য়) স্বভাবজাত ক্রিয়া, (৩য়) অভ্যাসজাত ক্রিয়া (৪র্থ) ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া।

(১ম) বিশেষ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়া—

যেমন একটী প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ তুলিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করি। ইহাতে আমাদের সুখস্পৃহা উত্তেজক, জ্ঞান পথ-প্রদর্শক ও প্রবৃত্তি কার্য্যের পরিচালক।

(২য়) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা মানব কখনও শিক্ষা করে নাই, কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ পায় নাই, অথচ বিশেষ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য স্বভাবতঃই তাহা করে—তাহা স্বভাবজাত ক্রিয়া; যথা, শিশুর স্তন পান। স্তনপানরূপ ক্রিয়াটীতে বিশেষ কৌশল আছে। যেরূপে টানিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ করিয়া টানা একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর, অথচ শিশু জননীর গর্ভ হইতে পড়িয়াই, বিনা শিক্ষায় ও বিনা উপদেশে সুন্দররূপে জননীর চুচুক মুখে লইয়া টানিয়া থাকে। ইহা পুষ্প-চয়নার্থে হস্ত-প্রসারণের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিচার পূর্ব্বক ক্রিয়া নয়, অথচ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়াও নয়। ইহাতে ইচ্ছার যোগ আছে অথচ জ্ঞানের যোগ নাই।

(৩য়) আর এক প্রকার ক্রিয়া, যাহার মূলে এক সময়ে ইচ্ছা ও জ্ঞানের যোগ ছিল, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ সে যোগ আর এখন লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। তাহা অভ্যাসজাত ক্রিয়া। যথা গমনার্থ পদবিক্ষেপ। আমরা গমনার্থ পদবিক্ষেপ করি, কিন্তু প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি আমাদের জ্ঞান থাকে যে পদবিক্ষেপ করিতেছি? এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান দেখা যায়? তাহা যায় না। আমাদের দৃষ্টি আকাশের নক্ষত্রে রহিয়াছে, আমাদের মন কোন নিগূঢ় প্রশ্নের মীমাংসাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে,

অথচ আমরা যাইতেছি, পদদ্বয় উঠিতেছে ও পড়িতেছে, গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। যেন কলে কার্য্য চলিতেছে। এক সময়ে মনের কর্তৃত্ব ছিল, এক সময়ে মনকে ভাবিতে হইয়াছিল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কত ফিকির ফন্দী করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই ক্রিয়া, কলের ক্রিয়ার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। একটী শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে চেষ্টা করে, সেই সময়ের বিষয় একবার চিন্তা কর; তাহাকে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিয়া হাঁটিতে হয়, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। এরূপ শুনাও গিয়াছে যে, কোন কোন লোক হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইয়া থাকে।

(৪র্থ) যে শারীরিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, আমাদের ঘোর সুষুপ্তির অবস্থাতেও চলিয়া থাকে, তাহা চতুর্থ শ্রেণী গণ্য। যথা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া, রক্তস্রোতের গতিবিধি ইত্যাদি। এ সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ক্রিয়াতেই আমরা কর্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছার বিদ্যমানতা দেখিতেছি। শিশু সন্তানের স্তনপান স্থলে, যদিও সে ক্রিয়া অজ্ঞতাসহকৃত ও স্বভাব-প্রণোদিত ক্রিয়া, তথাপি তন্মধ্যে শিশুর চেষ্টা আছে সুতরাং তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তিও আংশিকরূপে বিদ্যমান। সে মুখবিকাশ করিতেছে, হস্তদ্বয় প্রসারণ করিতেছে, স্তনদ্বয় ধরিতেছে, দুগ্ধ আকর্ষণ করিতেছে, এ সকল তাহার কার্য্য, সুতরাং এ সকলের অন্তরে তাহার ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-প্রবৃত্তি

বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইরূপ অভ্যাসজনিত কার্য্য যেস্থলে হইতেছে, সেখানেও অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যভাবে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া সেই পথিক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও ঠিক্ পথে যাইতেছে? পথের বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিতেছে? গো, মহিষ, শকট প্রভৃতির পথ পরিহার করিতেছে? যেখানে যেখানে মোড় ফিরিতে হইবে তাহা ফিরিতেছে? এতদ্দ্বারাই বোধ হয় যে, সে একটী চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকিলেও অতি সূক্ষ্মরূপে তাহাব দর্শন, শ্রবণ, বিচার প্রভৃতিও চলিয়াছে এবং তাহার ক্রিয়েচ্ছাও কার্য্য করিতেছে। এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাতেও গমনের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে পথের জ্ঞান রহিয়াছে, নতুবা, সে ব্যক্তি বিপথে যাইতেছে না কেন? নিদ্রিতাবস্থাতে যে আমাদের এক প্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্তি জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহার আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় যে, রাত্রিকালে উঠিয়া যদি কোন স্থানে গমন করিবার কথা থাকে এবং এক ব্যক্তি যদি সেই সংস্কার ও উৎকণ্ঠা লইয়া শয়ন করে, দেখিতে পাই, এক ঘুমের পর আপনাআপনি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? নিদ্রার মধ্যেও তাহার মনে যদি বিচার ও বোধ-শক্তি না থাকিবে, তবে সে কিরূপে ঠিক্ সময়ে জাগিল? একবার একখানি জাহাজ সমুদ্রে যাইতেছিল। যখন রাত্রি ১১টা তখন তাহার কাপ্তেন নিদ্রা গেলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার সময় দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র দ্বারা বুঝিলেন, যে, রাত্রি দুইটার

পর জাহাজ সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইবে, সে সময়ে জাহাজের মুখ একটু ফিরাইয়া না দিলে একটা বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা দেখিয়া তিনি প্রহরীদিগকে দুইটার সময় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘড়িতে ঠিক্ যখন দুইটা, প্রহরীগণ ডাকিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং দেখেন যে ঠিক্ দুইটা বাজিয়াছে; কিন্তু জাহাজ আশাতীত বেগের সহিত আসিয়াছে, এবং আর দশ মিনিট কাল তিনি নিদ্রিত থাকিলেই সেই বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বিপদ হইতে জাহাজ খানি বাঁচিয়া গেল। এখানেও দেখা গেল যে, গভীর নিদ্রার মধ্যেও বিচার ও বোধ-শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়ার মূলে আমরা ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-প্রবৃত্তির বিদ্যমানতা দেখিতেছি। কেবল যে সকল ক্রিয়াকে ইচ্ছা-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি, তন্মধ্যেই মানবের ক্রিয়েচ্ছা দেখা যাইতেছে না। অথচ তদুপরি মানবের কর্তৃত্ব শক্তি না থাকার অতি গূঢ় শুভ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। যে সকল ক্রিয়া জীবন-রক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক নহে, যাহার অকরণে হঠাৎ জীবন-নাশের সম্ভাবনা নাই, সে সকল কার্য্য মানবের ক্রিয়েচ্ছার অধীন রহিয়াছে; কিন্তু এই কতকগুলি ক্রিয়া মানব-দেহেই হইতেছে, এবং যাহার অকরণে মানবের জীবন-নাশের সম্ভাবনা, সে গুলির উপরে মানবের কর্তৃত্ব নাই। তবে তদুপরি কাহার কর্তৃত্ব? ইহা কি মানব-জীবনের

একটী আশ্চর্য্য তত্ত্ব নহে? এই বন্দোবস্তের প্রতি চিন্তাপূর্ণ-নয়নে চাহিয়া দেখিলে বিশ্ব-কারণে জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও ক্রিয়েচ্ছা তিনেরই কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্রসূতির প্রসব-বেদনা। একজন দেহ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, গার্ভিণীর যখন প্রসবকাল উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার বেদনা বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রসব সময়ে গর্ভিণী গর্ভস্থ ভ্রূণদেহের নিস্ক্রামণোপযোগী এক প্রকার বেগ দিতে থাকেন। তাহাকে কোঁত-পাড়া বলে। সহজ শরীরে মলত্যাগাদির সময়ে কাহাকেও যদি সেইরূপ কোঁত পাড়িতে হয়, তাহাতে কত পরিশ্রম ও কত বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-প্রবৃত্তি যদি কোথাও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তবে শ্রমজনক ক্রিয়ার মধ্যে। অথচ প্রসূতি যখন ঐরূপ কোঁত পাড়েন, তখন তদুপরি তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে না। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কর্তৃত্ব-শক্তি ও ক্রিয়েচ্ছার বহির্ভূত। যদি তৎপূর্ব্বে ক্লোরোফারম করিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে হতচেতন করিয়া ফেলা যায়, তথাপি যথাকালে ঐ বেগ আপনি প্রকাশ পাইবে। এত বড় একটা বেগ ও বলপ্রয়োগের কার্য্য হইতেছে; অথচ তাঁহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই, ইহাতে পাঠক কি বিবেচনা করেন? সে কার্য্য কাহার ইচ্ছাতে হইতেছে? সেই বেদনার সময় প্রসূতির উপরে উক্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য করিবার ভার রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারিত, এই জন্য বিশ্ব-কারণ আপনার হাতে

সেই ভার রাখিয়াছেন ; ইহা কি আপনাদের বোধ হয় না। ইহাও বিশ্ব-কারণে ক্রিয়েচ্ছা ও মঙ্গলভাব বিদ্যমান থাকার অপর একটী প্রমাণ।

অতএব বিশ্বকারণে জ্ঞান আছে ; এবং ক্রিয়েচ্ছা (Will) আছে। কেবল তাহা নহে, প্রীতিও আছে। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আসুন একবার চিন্তা করিয়া দেখি, প্রীতির সর্ব্ব-প্রধান চিহ্ন কি? আমি সুখী হইলে যে সুখী হয় এবং আমাকে সুখী করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই আমাকে প্রীতি করে। ইহা সত্য কি না? যদি দেখি আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়া জগতের এত অসংখ্য মানবের মধ্যে দশটী লোক আনন্দ করিতেছে ; এবং সেই দশ জন যাহাতে আমার আরও লাভ হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই দশ জন আমার মিত্র অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন। ইহা অতি সহজ কথা, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন পাঠক মহাশয় একটী সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হস্তে লইয়া বিচার আরম্ভ করুন। যদি নিকটে গোলাপের বাগান থাকে, তবে বিশেষ অনুরোধ করি যে, ত্বরায় একটী গোলাপ তুলিয়া আবার এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আচ্ছা মনে করিয়া লই, তাঁহার হস্তে একটী গোলাপ রহিয়াছে। ঐ গোলাপটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উহার পাপড়ীগুলি কেমন কোমল? উহার গন্ধ কেমন চিত্তের আনন্দদায়ক! উহার বর্ণ কেমন মনোমোহনকারী! এখন চিন্তা করুন, ঐ সুন্দর বর্ণ কেন ঐ পুষ্পে ঢালা হইয়াছে? তাহার

সুগন্ধ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, তাহা না থাকিলে ভ্রমর ইহার দিকে আকৃষ্ট হইত না এবং ভৃঙ্গ না আসিলে পরাগ-রেণু পড়িত না, ফল জন্মিত না। সুতরাং গন্ধের উল্লেখ করিলাম না। উহার বিচিত্র বর্ণ কেন দেওয়া হইল? সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবের নাম কি আপনারা করিতে পারেন, গোলাপের ঐ সুন্দর বর্ণ না থাকিলে, যাহার জীবন ধারণের ব্যাঘাত হইত? আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, পশু পক্ষীদিগের কাহারও প্রাণধারণ ঐ সুন্দর বর্ণের উপর নির্ভর করিতেছে না। উহার বর্ণ ওরূপ অত্যুজ্জ্বল ও সুন্দর না হইলে মধু লোভী ভৃঙ্গের আসিবার কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে উহাতে ওরূপ বিচিত্র বর্ণ না থাকিলে আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত কি না? কে বলিবেন যে, আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত? ইহার অভাবেও আমরা বাঁচিতাম, কিন্তু ইহা থাকাতে একটু সুখে বাঁচিতেছি; ইহা না থাকিলে একটু সুখের ব্যাঘাত হইত। তবে ত সৃষ্টির মূলে এরূপ দেখিতেছি যে, বিশ্বকারণ এরূপ চাহিয়াছেন যে, আমরা যে কেবল কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকি তাহা নহে, কিন্তু বাঁচিয়া সুখে থাকি; এবং সেই জন্য আয়োজনও করিয়াছেন। প্রীতির পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে ইহা কি প্রীতি নহে? "কে গো তুমি বিশ্বের অন্তরালবাসী শক্তি, তুমি কেন চাও যে আমরা সুখে থাকি," ঐ গোলাপটী দেখিয়া আপনা-দের প্রাণ কি এরূপ বলিয়া উঠিতেছে না?

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে; অধিক বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। যে প্রীতি দেখিয়া

বিশ্ব-কারণে প্রীতির অনুমান করিতেছি, সেই মানব-প্রীতির বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। মনে করুন, আমাদের প্রীতি যদি না থাকিত, কেবল স্বার্থ ও সুখাসক্তিই যদি আমাদের পরিচালক হইত, সংসারের অধিকাংশ কাজ অব্যাঘাতে চলিত কি না? বণিক স্বার্থের জন্য পণ্যদ্রব্য আনিত, আমি পেটের দায়ে কিনিতাম, পাচক বা পাচিকা স্বার্থের জন্য শ্রম করিত, আমার অন্ন পান যুটিয়া যাইত; এইরূপ চলিয়া যাইতেছে। পুরুষ সুখাসক্তির জন্য স্ত্রীলোককে চাহিত; স্ত্রীলোক সেই কারণে পুরুষের সঙ্গিনী হইত। ইহাতে কি প্রাণ রক্ষা ও সৃষ্টি রক্ষা হইত না? কিন্তু কে এই স্বার্থ ও সুখাসক্তির মধ্যে প্রেম নামে একটা পদার্থকে ঢালিয়া দিল, দিয়া সমুদায়কে মধুময় করিল! আহা! প্রেম কি পদার্থ! কোন কবি কোথায় আছেন, যিনি এই স্বর্গীয় পদার্থের মহিমা অদ্যাপি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন! পাচিকা ব্রাহ্মণী যে পয়সার লোভে খাটিতে আসিয়াছে, আমার প্রতি উহার স্নেহ ও ভালবাসা পড়ুক, অমনি উহার ঐ হস্তের শ্রম মিষ্ট হইয়া যাইবে, শ্রম করিয়া প্রাণ পরমাপ্যায়িত হইবে, আমি সুখে আহার করিলে ও ব্যক্তি স্বর্গ হাতে পাইবে; আমিও সেই অন্নের সঙ্গে অমৃত আস্বাদন করিব। ধন্য প্রেম, তোমাকে ছোঁয়াইলে লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। অনেক স্থলেই আমরা প্রেমের অভাবে বাঁচিতে পারিতাম বটে, কিন্তু এমন সুখে বাঁচিতে পারিতাম না। কে গো বিশ্বের অন্তরালবাসিনী শক্তি, তুমি কেন চাও যে আমরা সুখে থাকি? এই প্রশ্ন আবার মনে উদয় হইতেছে। আর ইহাও কি সম্ভব যে,

মানব-হৃদয়ে এই প্রেমাগ্নি দেখিতেছি অথচ যে বিশ্ব-কারণ হইতে মানব-হৃদয় সমুৎপন্ন, তাঁহাতে সেই প্রেমাগ্নি নাই? অতএব বিশ্বকারণে যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা আছে, তাহা নহে, প্রেমও আছে।

কেবল তাহা নহে, তাঁহাতে আরও কিছু আছে। মানব প্রকৃতির আর একটী গূঢ় তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মনে করুন, একজন লোকের সিন্ধুকের চাবিটী হারাইয়া গিয়াছে। তিনি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে অনেক গুলি চাবি আনাইয়াছেন; এক একটী করিয়া চাবি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। যে চাবিটী গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কিন্তু লাগিতেছে না, তিনি এদিক ওদিক সেদিক করিয়া বার বার দেখিয়া শেষে বলিতেছেন, না এটা লাগিল না, এই বলিয়া সেটীকে পরিত্যাগ করিতেছেন। কিম্বা মনে করুন, এক ব্যক্তি শুনিয়াছিলেন যে, কোন একটী বিশেষ দ্রব্যে বমন নিবারণ করে। তিনি এক শত স্থলে সেইটী প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, বমন নিবারণ করে না। তৎপরে তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার শুনা কথা মিথ্যা। তিনি উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। আর পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিল না। মানবের সকল কার্য্যেই এরূপ দেখা যায়। দশবার দেখিয়া যাহাতে বিফল হওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস থাকে না। সকলেই বলিবেন, ইহাই মানব-মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি আপনার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। সত্য,

ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা লাভের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। এই সংগ্রামের প্রকৃতি আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা ইহার মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করি। (১ম) এই সংগ্রামে দুর্ব্বলতা বশতঃ বার বার অকৃতকার্য্য হইয়াও সাধুতা শ্রেষ্ঠ নয় বা সাধুতার জয় হইবে না, এরূপ বিশ্বাসে কেহ উপনীত হয় না;—সে শতবার পড়িয়াও আশা করে। অন্যান্যস্থলে দশবার হারিলে নিরাশ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের স্থলে শতবার হারিয়াও নিরাশ হইতেছে না। (২য়) সে যখন দুষ্প্রবৃত্তিদিগের বশবর্ত্তী হইয়া পতিত হইতেছে তখনও পতিত হইতে হইতে ইহা অনুভব করিতেছে যে,ধর্ম্মেরই জয়যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ সে পাপের দাসত্ব করিতে করিতেও পুণ্যের মহত্ত্ব অনুভব করে। (৩য়) এই ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সে যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে, কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করে না যে, ধর্ম্মের উপরে উঠিয়াছে; এবং তাহার লাভ করিবার আর কিছুই নাই; বরং যে যত ঊর্দ্ধে উত্থান করে, সে তত মস্তকের উপরে ধর্ম্মকে উন্নত দেখিতে পায়। প্রথম দুইটী হইতে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, ধর্ম্মের মহত্ত্বে বিশ্বাস মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। ইহা অপরাপর বিশ্বাসের ন্যায় নয় যে, অকৃতকার্য্য হইলে উঠিয়া যায়। তৃতীয়টী দ্বারা এই সত্য অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের যে ভাব আছে, তাহার কোন একটী সীমা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের মহত্ত্ব জ্ঞান স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মভাবের মধ্যে অনন্তের ভাব মিশ্রিত; এই উভয় সত্য এক সঙ্গে আলোচনা করিলে কিরূপ ভাব মনে উদয় হয়?

ইহাতে কি এই বিশ্বাস অন্তরে প্রবল হয় না যে, আমাদের প্রকৃতিতে যে ধর্ম্ম নিয়ম, সেই ধর্ম্ম নিয়ম সেই বিশ্বের আদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন ?

মানব হৃদয়ের এই ধর্ম্মভাবের গভীরতা যে কত, তাহা মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়। একি এক আশ্চর্য্যভাব মানবকে শাসন করিতেছে ! ! রোম-দেশ হইতে রাজাগণ যখন তাড়িত হইলেন, তখন দুইজন কনসলের উপর নগর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তখন রাজবংশের প্রতি রোমবাসীদিগের এত বিদ্বেষ যে তাঁহারা এই আইন করিয়াছিলেন যে, রোমনগরবাসী যে কোন ব্যক্তি পুনরায় রাজাদিগকে আনিবার ষড়যন্ত্র মধ্যে থাকিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। এইরূপ বিধি প্রচার হওয়ার পর কতকগুলি রোমীয় যুবক উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারার্থ উক্ত কনসল দ্বয়ের নিকটে নীত হইল। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই যুবকদলের মধ্যে একজন কনসলের দুইটী পুত্র ছিল। তিনি যখন বিচারাসনে, তখন সমুচিত বিচার করিয়া আইন সঙ্গত দণ্ড দেওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানে তিনি যথারীতি সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যখন স্বীয় পুত্রদিগের দোষ সপ্রমাণ দেখিলেন, তখন তাহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যখন ঘাতকগণ তাহাদিগকে বধভূমিতে লইয়া চলিল, তখন তিনি বস্ত্রে মুখ আবরণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। এক দিকে অপত্য-স্নেহ অপর-দিকে কর্ত্তব্য জ্ঞান, সংগ্রামে কর্ত্তব্য জ্ঞানই জয়যুক্ত হইল। এমন ব্যাপারটী মানব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীতে কেহ কথনও

দেখিয়াছেন কি? বিগত মিউটিনীর সময় সার হেনরি লরেন্স অযোধ্যার কমিশনর ছিলেন। তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ভগ্নশরীর হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন; হঠাৎ লক্ষ্ণৌ নগরে সংবাদ আসিল যে, সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌএর দিকে আসিতেছে। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, সেই বিপদের সময়ে তাঁহার নিজের গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশীয়দিগের প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সেই রুগ্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক দল সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং ২৪ ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। তৎপরে পরাজিত হইলে, লক্ষ্ণৌ নগরের রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসিয়া, সহরের ও চতুঃপার্শ্বের সমুদায় ইংরেজকে সেই বাড়ীতে পুরিয়া বাড়ীটীকে দুর্গপ্রায় করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক দিন এক কামানের গোলা তাঁহার গৃহ মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। সেই প্রহার বেদনায় তিনি মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কয়েকদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই অসহ্য যাতনার মধ্যেও সতত সেই বাড়ীতে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, আহতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্তের উপদেশ দিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার পরামর্শ দিতেছেন, শিশুদিগের তত্ত্ব লইতেছেন। কে কোন পশুতে এ প্রকার কর্ত্তব্য জ্ঞানের কল্পনাও করিতে পারেন কি না? শরীর মন সমুদায় অবসন্ন, সমুদায় বিশ্রাম চাহিতেছে, কিন্তু

কর্ত্তব্য জ্ঞান চুলে ধরিয়া পরিশ্রম করাইতেছে—এই স্বর্গীয় দৃশ্য কেবল মানবেই সম্ভব। একদিকে যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান অপরদিকে অনুতাপ। অনুতাপের অশ্রু মুক্তাফল হইতেও সুন্দর। এ অশ্রু ফেলিবার অধিকার কেবল মানবেরই আছে। আমার যাহা করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারি নাই, ইহা বলিয়া কোন নিকৃষ্ট প্রাণীকে কবে ম্লান দেখিয়াছেন? এই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও লজ্জার গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব। যিনি এই উচ্চতা ও গভীরতাকে মানব-প্রকৃতিতে নিহিত করিয়াছেন, তিনি যে "ধর্ম্মাবহ পাপানুদ" ধর্ম্মের আবহ ও পাপের শাস্তি-দাতা," তাহা কি সহজ বুদ্ধিতেই অনুভব করা যায় না?

তবেই দেখুন, সেই আদ্যাশক্তিতে যদি জ্ঞান থাকিল, ক্রিয়েচ্ছা থাকিল, প্রেম থাকিল; ধর্ম্ম নিয়ম থাকিল, তাহা হইলে তিনি তাড়িত বা অন্য কোন ভৌতিক শক্তির ন্যায় জড় শক্তি হইলেন না, কিন্তু সচেতন পুরুষ হইলেন। যে অর্থে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহার হয়, সে অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। জ্ঞান প্রীতি ও ক্রিয়েচ্ছা সম্পন্ন যিনি, তিনি পুরুষ। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত যোগ দিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

অর্থ—"অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী এই মহান জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আমি জানিয়াছি—ইহাঁকে লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যু ভয় অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই

অবরোধ প্রথা।

আমাদের দেশে রমণীদিগকে যতপ্রকার সামাজিক দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, অবরোধ প্রথা তাহার একটী। রমণীগণ অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, পুরুষ সমাজে মিশিবার অধিকার নাই। লোকের মনে এইরূপ সংস্কার যে নারীগণ যদি পুরুষগণের সহিত স্বাধীনভাবে মিশিতে পান, তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে, সমাজের পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। এইরূপ আশঙ্কা যাঁহারা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের মত সমর্থনার্থ মুনিজনের বচন পরম্পরাও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ॥

অর্থ—নারী ঘৃতকুম্ভ সমান, পুরুষ তপ্ত অঙ্গারের সমান, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ঘৃত ও অঙ্গার একত্রে রাখিবেন না।"

এইরূপ সংস্কার লোকের মনে বদ্ধমূল থাকাতে তাঁহারা রমণীর স্বাধীনতার নামেই খড়্গহস্ত হন। এই প্রথার সপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার কি আছে, তাহা বিবেচনা করিবার অবসর থাকে না। কিন্তু এপ্রকার উত্তেজিত হইলে সত্য নির্ণয়ের পক্ষে ব্যাঘাত হয়। মনকে উত্তেজনা-শূন্য করিয়া এই প্রশ্নের বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপে প্রশ্নটীর বিচার করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক এই প্রবন্ধটী পাঠ করুন।

ঈশ্বর আমাদিগকে দেহ মনের যত প্রকার শক্তি দিয়াছেন সেই সকল শক্তির দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন করা এবং অপরের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই মানবজীবনের লক্ষ্য যে সমাজ বা যে প্রথা মানবের এই লক্ষ্য সিদ্ধির অনুকূল না হইয়া বরং পরিপন্থী হয়, ও যে সমাজ ও যে প্রথা মানব-জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধির বিরোধী, তাহাতে বাস করিয়া ও তাহার পরিপোষণ করিয়া মানবকে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে রমণীর অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকাতে রমণীদিগকে অধোগতি প্রাপ্ত করা হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে পুরুষ সমাজ ও অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অবরোধ প্রথার সপক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি আছে, তাহা পাঠকের সমক্ষে অর্পণ করা যাইতেছে, তিনি স্থির-চিত্তে বিচার করিয়া দেখিবেন।

অবরোধ প্রথার সপক্ষ লোকেরা বলিয়া থাকেন ;

১ম। জগতের কর্ত্তা পুরুষও রমণীর প্রকৃতি ও কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। পতিসেবা, গর্ভধারণ সন্তান-পালন, 'রমণীর' প্রধান' কার্য্য' সুতরাং তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র গৃহের মধ্যে ; বাহিরের কোলাহল ও উত্তেজনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি? তদ্দারা নারীর কোন উপকার নাই বরং অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহার অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য সকল লঙ্ঘিত হইবে, গৃহ-ধর্ম্মের মিষ্টতা চলিয়া যাইবে, সন্তানগণের রক্ষা ও শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। অতএব রমণীর অন্তঃপুর মধ্যে রুদ্ধ থাকিবার যে নিয়ম আছে তাহা উৎকৃষ্ট।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—এই যুক্তির মধ্যে সত্য যে কিছু নাই তাহা নহে। গৃহ-রক্ষা, সন্তান পালন ও সন্তানের রক্ষা প্রভৃতি যে প্রধানতঃ রমণীর ভার তাহা কেহ অস্বীকার করে না। সর্ব্ব-দেশে, সর্ব্ব সমাজে রমণীগণ এই ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশেই বা সে প্রথার অন্যথা হইবে কেন? এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলাম। বরং একটু অধিকও বলি, দেখা গিয়াছে যে যেখানে যেখানে পেটের দায়ে রমণীকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে, সেই খানেই এই গুরুতর কর্ত্তব্য গুলির ব্যাঘাত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্য কলে খাটিতে যায়। প্রাতঃকালের প্রারম্ভ হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গুরুতর পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে তাহাদের পতিগণকেও সমস্ত দিন গুরুতর শ্রমে অন্যত্র আবদ্ধ থাকিতে হয়। দারিদ্র্যের তাড়না এমনি ভয়ঙ্কর, যে পতি পত্নী উভয়ে উপার্জ্জন করিয়াও অনেক সময় দারিদ্র্যের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। এরূপ স্থলে তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে দেখে কে? হয় মাতাকে শ্রমে যাইবার সময় শিশুগুলিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, না হয় বাড়ীতে কোন লোক ভাড়া করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে হয়। কার্য্যস্থলে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ পছন্দ করেন না যে রমণীগণ স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে আনিয়া তাহাদেরই পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকে; সুতরাং অধিকাংশ স্ত্রীলোকই দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করে। সচরাচর ঐ

রমণীরা দশ জনে মিলিয়া কোন একটী বৃদ্ধা নারীকে স্থির করে, তাহাকে স্বীয় স্বীয় আয় হইতে তাহার তত্ত্বাবধারণের মূল্য স্বরূপ কিছু কিছু দেয়, এবং তাহার নিকট সন্তানগুলি দিয়া ও আবশ্যক ব্যয়ের উপযোগী অর্থ দিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করে। কেহ কেহ দিনান্তে সায়ংকালে আসিয়া স্বীয় স্বীয় সন্তান ফিরাইয়া লয়; কেহ কেহ বা সপ্তাহান্তে শনিবার আসিয়া সন্তান লইয়া যায়। এইরূপে পরের সন্তান পালন করা ঐ বৃদ্ধা নারীদিগের একটা ব্যবসায় হইয়াছে। যেখানে ব্যবসায়-বুদ্ধি সেইখানেই লাভের চেষ্টা। শিশুগুলি অসহায়, তিনবার দুধের পরিবর্ত্তে দুইবার দিলে কিছু বলিতে পারে না; সুতরাং শিশুগুলি অর্দ্ধাহারে থাকে; কখন কখনও আফিং খাওয়াইয়া তাহাদিগকে ঘুম পাড়ান হয়। এইরূপে শিশুগুলি দিন দিন জীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া অল্পকালের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। দারিদ্র্য এবং দুর্নীতিতে মানব-হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলে; শিশুগুলি জননীদিগের পক্ষে বিষম ভারস্বরূপ হয়, সুতরাং তাহাদের অকাল-মৃত্যুর আশঙ্কা দেখিয়াও তাহারা বিশেষ ক্লেশ পায় না। এইরূপে বহুসংখ্যক শিশু সন্তান বর্ষে বর্ষে অকাল-মৃত্যুতে পতিত হয়। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া অবরোধ প্রথার সপক্ষগণ বলিতে পারেন;—দেখ রমণীকে গৃহধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহিরে প্রেরণ করিলে তাহার কি বিষময় ফল ফলিয়া থাকে; এ সকলের দ্বারা কি এই শিক্ষা পাওয়া যায় না যে রমণীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহেরই মধ্যে ?

ইহা মানিয়াও দুইটী প্রশ্ন করা যায়? রমণীর কার্য্য ক্ষেত্র গৃহের মধ্যে ইহা বলিলে সেই সঙ্গে ইহা বলা হয় না, যে

তিনি গৃহ প্রাচীরের চতুঃসীমা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না; বা সেই গৃহের বাহির হইয়া শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন না; অথবা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন না। অধিকাংশ পুরুষকে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিতে হয়, গৃহস্থালি সকল কাজ করিতে হয়, তাহা করিয়াও যদি তাঁহাদের অনেক ভাল কাজে হাত দিবার সময় থাকে, রমণী কেন নিজ কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত না করিয়া সেইরূপ কাজে হাত দিতে পারিবেন না? এমন যুক্তি কি আছে, যাহাতে এতদূর বলিতে পারা যায়, যে গৃহ-প্রাঙ্গণের বাহিরে একখানি পা বাড়াইলেই তাঁহার পক্ষে অন্যায় করা হয়? দ্বিতীয়তঃ যে সকল নারী গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট, অর্থাৎ যাঁহারা পত্নী ও মাতার কর্ত্তব্যভার স্বীয় স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র যেন প্রধানতঃ গৃহের মধ্যেই হইল, কিন্তু যে সকল নারী সেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিবেন না, অর্থাৎ যাঁহারা কৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জন-সমাজের কল্যাণ-সাধনে দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেত ও নিয়ম খাটে না। যদি কেহ বলেন;—নারী মাত্রেরই একটা বিবাহ ঘটাইয়া দিতে হইবে, তবে তাঁহাকে বলি তোমার অধিকার কি? কোন রমণী অনুভব করেন যে কৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া তিনি ঈশ্বর ও মানবের সেবা সমধিক পরিমাণে করিতে পারিবেন, তাঁহার কি সে অধিকার থাকা কর্ত্তব্য নয়? তাহাতে হস্তার্পণ করিলে তুমি কি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে না? সুতরাং এরূপ রমণীদিগের প্রতি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি খাটে না।

অবরোধ প্রথার সপক্ষগণ আরও বলিয়া থাকেন রমণীগণ অবলা; আত্ম-রক্ষাতে অসমর্থ; সুতরাং পুরুষের বশে আশ্রয়ে থাকাতেই তাঁহাদের কল্যাণ; তাঁহারা যদি স্বাধীনভাবে জনসমাজে বিচরণ করিতে যান, তাঁহাদিগকে পদে পদে বিপদে পড়িতে হইবে এবং তাঁহারা আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবেন না।

এই যুক্তির উত্তর এই,—রমণীদিগকে সকল বিষয়ে পরাধীন রাখাতেই তাঁহাদের চরিত্রে সেই তেজ ও স্বাবলম্বনশক্তি জন্মিতে পারে নাই, যদ্দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে বিপদের মধ্যে রক্ষা করিতে পারেন। স্বাবলম্বনেই মানবের মনুষ্যত্বের উৎপত্তি; পরমুখাপেক্ষিতাই মানবকে হীন-সাহস ও নির্বীর্য্য করে। একবার নারীগণকে এই শিক্ষা দেও যে পুরুষের ন্যায় তাঁহাদেরও জীবনের মহৎ লক্ষ্য আছে, এবং তাহা সংসাধনের জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অগ্রসর হইবার পথ ছাড়িয়া দেও অমনি দেখিবে আর এক তেজ ও আর এক শক্তি তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে।

আর যদি ইহা স্বীকার করাও যায় যে তাঁহারা দুর্ব্বলা ও চিরদিন দুর্ব্বলা থাকিবেন, তাহা হইলে ত ইহা প্রমাণ হয় না যে তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধই থাকিতে হইবে বড় জোর এই বলিতে পার যে তাঁহারা যখন বাহিরে যাইবেন, তখন পিতা, বা ভ্রাতা, বা পতি, বা অন্য কোন পুরুষ তাহাদিগের রক্ষী হইয়া সঙ্গে থাকিবেন। ইহা বেশ কথা। যে যে দেশে রমণীদিগের অবরোধ নাই সেখানে বুদ্ধিমান,

গৃহস্থ মাত্রেই এইরূপ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহাদিগের রক্ষক দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের সহিত রক্ষক দিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের চরিত্র গঠিত, ও যাঁহাদের আত্ম-রক্ষা বিধানের সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম নাই, থাকায় আবশ্যকও দেখা যায় না।

তৃতীয়তঃ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সমাজে মিশিতে গেলেই নানা প্রকার প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইতে হয়; নানা প্রকৃতির, নানা ভাবের লোকের সহিত সতত সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়; প্রতিনিয়ত লোকের অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; ইহাতে প্রকৃতির কোমলতাগুণ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। জলে রৌদ্রে ঝড়ে বৃষ্টিতে যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার দেহের কান্তির স্নিগ্ধতা ও কোমলতা যেমন আর থাকে না, সেইরূপ পৃথিবীর পাপ তাপের মধ্যে সর্ব্বদাই যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার চরিত্রের সুস্নিগ্ধ কমনীয়তা আর থাকে না। এই কারণে পুরুষের চরিত্রে উগ্রতা, কঠোরতা, অসহিষ্ণুতা, বিবাদ-পরায়ণতা অধিক। নারীদিগকেও কি সেই দশাতে ফেলিতে হইবে? এক্ষণ "গৃহ" "পরিবার" প্রভৃতি শব্দগুলি আমাদের কর্ণে যে এত মধুর তাহার কারণ এই যে বাহিরের জগতের উত্তাপ হইতে যখন আমরা "গৃহের" মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করি, তখন সেখানে জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, ও কন্যাদিগের ভালবাসা পাইয়া সে সমুদায় উত্তাপ ভুলিয়া যাই। একবার রমণীদিগকে বাহিরের সেই উত্তাপের মধ্যে ঘুরিতে দেও, গৃহ ও পরিবার আর সুখের স্থান থাকিবে না; জনসমাজের

পাপ মলিনতার উত্তাপে তাঁহাদের ও প্রকৃতি উগ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে; তখন বাহিরে অগ্নি ভিতরে অগ্নি, আঁর গৃহাভিমুখে আসিতে ইচ্ছা হইবে না; সুতরাং সমাজ দুর্নীতির সাগরে ডুবিবে।

ইহার উত্তর এই;—নারীগণকে অবরোধে আবদ্ধ রাখিও না, স্বাধীন ভাবে সমাজে মিশিতে দেও একথা বলিলে ত ইহা বলা হয় না যে তাঁহারা গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জন কোলাহলের মধ্যে, বিষয় বাণিজ্যের মধ্যে, বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। অগ্রেই বলা হইয়াছে গৃহধর্ম্ম তাঁহাদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইবে। নীড়ের মধ্যে পক্ষিণী যেমন শাবকগণকে নিজ পক্ষের দ্বারা আবরণ করিয়া বসিয়া থাকে, সেইরূপ নারী নিজ ক্রোড়ে শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবেন। বিধাতা তাঁহাকে এই মহাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন। যে কার্য্য করিতে গেলে তাঁহার এই মহাব্রতের ব্যাঘাত হয়, তিনি তাহা হইতে দূরে থাকিবেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে অন্তঃপুরের বাহিরে একখানি পা বাড়াইতে পারিবেন না, ইহা কে বলিল? জ্ঞানোন্নতির জন্য, আত্মোন্নতির জন্য, শিশুদিগের রক্ষা ও শিক্ষার জন্য, পরিবারের উন্নতির জন্য, পরহিতের জন্য, তিনি আবশ্যক মত বাহিরে যাইতে পারিবেন না, এরূপ কঠিন শাসনের যুক্তি কি? আর পৃথিবীর পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই যে তাঁহাদের চরিত্রের স্নিগ্ধতা ও কোমলতা বিলুপ্ত হইবে তাহারও যুক্তি দেখা যায় না এবং সেরূপ কোমলতা প্রার্থনীয় ও নহে। পাপের অজ্ঞতা জনিত যে, কোমলতা

তাহা এজগতের জন্য নহে। তাহা দেখিতে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর নাই। যে সাধুতা পাপকে কখনও দেখে নাই, প্রলোভনের সহিত একটী দিনও সংগ্রাম করে নাই, সে সাধুতা মানব জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সুখ জানে না; তাহা কাচের ন্যায় ভঙ্গ-প্রবণ। কিন্তু যে সাধুতা পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিয়াছে, প্রলোভনের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, পবিত্রতাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া প্রাণে পোষণ করিয়াছে, তাহাই এ পৃথিবীর জন্য, এবং তাহার মূল্য অনেক। আমরা নরনারীতে এইরূপ সধুতাই দেখিতে চাই। এইরূপ সাধুতা লাভে সমর্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তুমি নরনারীকে কত দিন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে? ঈশ্বরের রাজ্যে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে দেও, তাহারা পুণ্যও দেখুক পাপও দেখুক; তবে এমন শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দেও, যাহার গুণে পাপকে পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যকেই আলিঙ্গন করুক। আর ইহাওত সত্য নয়, যে অবরোধে আবদ্ধ থাকিলে নারীগণ পাপ প্রলোভন জানিতে পারে না। কাহার অবিদিত আছে, যে আমরা রমণীদিগকে অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিয়া ও পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। বরং যেখানে নারীর চরণে যত কঠিন নিগড় সেই থানেই মানব-প্রকৃতি অধিক প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সেই থানেই গুপ্ত পাপের স্রোত তত প্রবাহিত। ধনিদের ঘরে নারীর ঘোর বন্দিদশা, তাঁহাদের ঘরেই নারীর ঘোরতর অযশ?

চতুর্থতঃ তাঁহারা বলেন, যে পুরুষের সহিত নারীর এরূপ

সম্বন্ধ, যে নারী পুরুষের নিকট একটা প্রলোভনের বস্তু; সুতরাং নারীগণের বাহিরে গমনাগমন করা যদি নিয়ম হয়, তাহা হইলে অনেক নারীকে বিপদে পড়িতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রূপলাবণ্যশালিনী, তাঁহাদিগকে দুশ্চরিত্র পুরুষগণ উত্যক্ত করিবে, এবং ছলে, বলে, কৌশলে, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিবার প্রয়াস পাইবে। এইরূপে অনেক বালিকা ও যুবতীর সর্ব্বনাশ হইবে। এরূপ বিপদের মুখে নারীদিগকে ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন কি? নারীগণ স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পাইলে যে এরূপ ঘটিতে পারে না, তাহা নহে। বরং ইংলণ্ডে সম্প্রতি যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ইহা দেখা গিয়াছে, যে সেখানে অনেক ভদ্র মহিলাকে প্রতিদিন দুশ্চরিত্র পুরুষের হস্তে এইরূপে অপমানিত হইতে হয়। কিন্তু তাহার উপায় আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল পুরুষেই যে নারীকে প্রলুব্ধ ও বিরক্ত করে তাহা নহে, দুশ্চরিত্রা নারীরাও অনেক সময় পুরুষগণকে প্রলুব্ধ ও বিরক্ত করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহানগরের বারনারীগণের বিষয় স্মরণ কর। ইহারা রাজপথে পুরুষগণকে কিরূপ প্রলুব্ধ ও উত্যক্ত করিয়া থাকে! কোন কোন স্থানে ইহাদের ধৃষ্টতা এতদূর অধিক যে ইহারা পুরুষদিগকে রাজপথ হইতে বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়। এই উৎপাত নিবারণ করিবার জন্য কেহ কোন দিন কি এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে পুরুষদিগকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে? তাহার অন্য উপায় আছে। ইংলণ্ডে এই আইন করা হইয়াছে, যে যদি

কোন স্ত্রীলোক রাজপথে বা অন্য কোন স্থানে কোন পুরুষকে প্রকাশ্যভাবে প্রলুব্ধ ও বিরক্ত করে তাহাকে জরিমানা ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। দুশ্চরিত্র পুরুষদিগের প্রতিও সেইরূপ শাসন থাকা উচিত। তাহা হইলে এরূপ অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও অপরাপর দেশে নারীগণ যে সহসা পুরুষের ফাঁদে পড়িয়া যায় তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে নারীগণের চরিত্রে দৃঢ়তা থাকে না। নিম্ন শ্রেণীর বালিকাগণ, হাবা, অজ্ঞ, অশিক্ষিত,ও ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন,তাহাতে আবার দারিদ্র্যের তাড়নে অস্থির; সুতরাং ধনলোভে ও প্রেমলোভে হঠাৎ পতিত হয়। পুরুষদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য যত প্রকার আয়োজন আছে, রমণী দিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য সেইরূপ আয়োজন কর দেখিতে পাইবে নারীগণ দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে মনে করিবে, সামান্য পদার্থের লোভে প্রলুব্ধ হইবে না, এবং নিজের ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। আর একটা কথা আছে পুরুষ যে নারীকে উত্যক্ত করিতে ও বিনষ্ট করিতে এতদূর সাহসী হয় তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা নারীর দুশ্চরিত্রতার প্রতি যত খড়্গ-হস্ত, পুরুষের দুশ্চরিত্রতার প্রতি তত খড়্গ-হস্ত নহি। এই নীতির বৈষম্য থাকাতে সমাজ মধ্যে প্রতিদিন যে অন্যায়াচরণ হইতেছে তাহা স্মরণ করিলে লজ্জিত হইতে হয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া কি ষোড়শবর্ষীয়া বালিকাকে ভুলাইয়া গৃহের বাহির করিয়া লইয়া গেল। তাহাকে লইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইল; যত দিন তাহার গহনাগুলি ছিল. তাহা

বিক্রয় করিয়া নিজের বাবুগিরির ব্যয় চালাইল ; তৎপরে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাহাকে বিদেশে বারাঙ্গনা বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিবার জন্য পরিত্যাগ করিয়া আসিল। আসিবামাত্র তাহার আত্মীয় স্বজন আনন্দিত অন্তরে তাহাকে বাড়ীতে গ্রহণ করিলেন, সে সমাজের মধ্যে যে স্থানে ছিল তাহাতেই থাকিল ; তাহার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল ; আর একটী রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না বালিকার অন্বেষণ হইতে লাগিল। ইহা সত্য ঘটনা। এইরূপ আরও কত ঘটনা ঘটিতেছে। যে হতভাগিনীকে সে পথে ফেলিয়া আসিল, সে যে কি পাপে ডুবিল, কি যাতনার অগ্নিতে পুড়িল, তাহা কেহ ভাবিল না, কিন্তু অধর্ম্মের কুষ্ঠে যাহার আত্মা পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে, সেই পামরকে সকলে ক্রোড়ে করিয়া লইল। এই ত তোমাদের সমাজের অবস্থা। এইরূপ বৈষম্য যত দিন থাকিবে পুরুষের হস্ত হইতে নারীকে বাঁচাইতে পারিবে না। একবার সিংহ গর্জ্জনে বল দেখি, "পরের ভগিনীকে যে মজাইবে আমরা তাহার মুখ দর্শন করিব না," অমনি দেখিবে পুরুষের নীতি ফিরিতে আরম্ভ হইবে। তোমরা দুরন্ত পুরুষের দৌরাত্ম্য নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিতেছ না, কেবল নারীকেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার উপদেশ দিতেছ। ন্যায় কোথায় রহিল ?

আর একটী যুক্তি যাহা অবরোধ প্রথার সপক্ষগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা উল্লেখ করিতেও লজ্জা হয়। তদ্দ্বারা সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ অবিচার করা হইয়াছে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। সে যুক্তিটী এই—স্ত্রীলোকের প্রতি

বিশ্বাস নাই, তাহাদের সর্ব্বদাই পাপে মতি, পুরুষকে বিকৃত করাই তাহাদের প্রধান কাজ ;—

স্বভাব এব নারীণাং নরানামিহ দূষণং

অর্থ—পুরুষদিগকে দূষিত করাই নারীদিগের স্বভাব। অতএব তাহাদিগকে বন্দিদশায় রাখা কর্ত্তব্য ?

কি অন্যায় কথা ! এইরূপ তর্কেতে রামমোহন রায় এক বার মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিলেন, এবং ভারত নারী-দিগকে এই অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। যে সকল পাঠক অদ্যাপি তাহা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার সেই উক্তিগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন ; কিরূপে তিনি পুরুষের উপরি নারীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পৃথিবীতে যেখানে যত মনুষ্য-সমাজ আছে, কি সুসভ্য কি অসভ্য, সর্ব্বত্র পরিদর্শন কর, ধৈর্য্য,-সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম ও পবিত্রতা বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীকে শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাইবে। অসৎ হওয়া দুইএর পক্ষেই সম্ভব ; কিন্তু পুরুষ সে পথে যতদূর যায়, নারী তত দূর যাইতে পারে না। সকল দেশের কারাগার পরিদর্শন কর, স্ত্রী-বন্দীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা কত কম। অথচ সর্ব্ব-দেশেই নরনারীর সংখ্যা প্রায় সমান। তৎপরে যেখানে যেখানে নারীকে পাপের গর্ত্তে পতিত দেখিতে পাইতেছ, অনুসন্ধান কর, করিলে দেখিতে পাইবে যে অধিকাংশস্থলেই পুরুষ হাতে ধরিয়া তাহাকে সেই গর্ত্তে ফেলিয়াছে ; এবং তাহার মধ্যে হৃদয়-বিদারক কাণ্ড এই, যে নারীকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া পুরুষ নিজে গৃহে গিয়া আরাম সম্ভোগ করিতেছে,

এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে আরও গভীরতর গর্ত্তে ডুবাইবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহার পর যদি কেহ বলে যে, পুরুষকে দূষিত করাই নারীর স্বভাব, তাহা হইলে কেমন সুবিচার হয়? জগতের ইতিহাসে ইহার বিপরীত কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেখানে যেখানে নারীর শক্তি প্রকাশ পাইতে পারিয়াছে, সেইখানেই সমাজের নীতির উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছে। রোমরাজ্যের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, যে রোমনগর একবার রমণীদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। রোমানদিগের পত্নীগণ শত্রুশিবিরে গিয়া আপনাপন পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির করে ধরিয়া রোমনগরকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি রোমনগরে নারীগণের অতিশয় সমাদর ছিল। এই সমাদরের ভাব এত দূর প্রবল ছিল যে, সতী লুক্রিশিয়ার প্রতি অত্যাচার করাতে রাজপরিবারকে জন্মের মত রোমনগর হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। সমুদায় রোমবাসি প্রজা সশস্ত্র হইয়া রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। নারীগণের প্রতি এই সম্ভ্রম ও সমাদর যত দিন ছিল, পুরুষগণের নীতি ততদিন উজ্জ্বল ছিল। প্রাচীন রোমানদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, সাধুতার কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। কিন্তু কালক্রমে রোমের রাজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইয়া রোমীয় যুবকগণ যতই স্বীয় স্বীয় জননী, ভগিনী, পত্নী প্রভৃতির নিকট হইতে দূরে থাকিতে লাগিল, এবং পূর্ব্ব দৈশীয় সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের রসাস্বাদন করিতে লাগিল, এবং প্রাচ্য রাজকুলের সংশ্রবে আসিয়া স্ত্রীলোককে একটা ভোগ্য বস্তুর মধ্যে গণনা করিতে লাগিল, ততই রোম মধ্যে দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত

হইতে লাগিল। নারীর অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষেরও অধোগতি উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ান যে বলিয়াছিলেন, ফ্রান্সের প্রধান অভাব মাতা, তাহার অর্থ এই, ইংরাজ পুরুষদিগের প্রতি তাঁহাদের জননীগণের যেরূপ প্রভাব, ফরাসি দেশীয় মাতাগণের যদি সেরূপ প্রভাব থাকিত, তাহা হইলে ফরাসি চরিত্রে এত হীনতা থাকিত না। ইহার আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে যে সামাজিক নীতির জন্য তুমুল আন্দোলন হইয়াছে, তাহার মূলেও নারীর চেষ্টা। আগে ইংলণ্ডের আইন এই ছিল, যে, কোন কাপুরুষ কোন একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার সম্মতিক্রমে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে তাহাকে বল-প্রয়োগ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত না; কিন্তু এক্ষণে এই আইন হইয়াছে ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন বালিকার সম্মতি দিবার অধিকার নাই। যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া এই আইন করাইয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক। যে পরিমাণে ইংরাজ রমণীগণ স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে পাইতেছেন, সেই পরিমাণে সমাজের নীতির উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের ঘরের নিকটেও দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, রেলওয়ের কর্ম্ম উপলক্ষে বা অন্য কোন কর্ম্ম উপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালি বাস করিত, তাহারা দুষ্ক্রিয়ার জন্য লোকের ঘৃণিত হইয়াছিল। তাহাদের পাপাচরণে বাঙ্গালি নামের প্রতি সে দেশের লোকের ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন গিয়া যদি কেহ সে সকল স্থানের বাঙ্গালিদিগের রীতি নীতি ও চরিত্র পরিদর্শন করেন. তিনি

দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। এখনকার বাঙ্গালিরা অধিকাংশ সৎ, শান্তি-প্রিয়, ও নিজ কার্য্যে মনোযোগী। এই পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, নারীগণের আবির্ভাবই সেই কারণ। এখন অধিকাংশ বাঙ্গালি ভদ্রলোক সপরিবারে সে দেশে বাস করিতেছেন। বঙ্গবালাগণের পদার্পণ মাত্র নরকের মধ্যে শান্তি ও শাসন স্থাপিত হইয়াছে; এবং পুরুষগণ নীতিমান হইয়াছেন। এতদ্দেশে ইংরাজ অধিকারের ইতিবৃত্তও এই। জব চার্ণক যখন সুতানটীর ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে তাঁবু গাড়িয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ষ্টীমার সার্ভিস খোলা পর্য্যন্ত ভারতীয় ইংরাজদিগের নীতি অতি জঘন্য ছিল। জাল, জুয়াচুরি, দাঙ্গা, লুট, ঘুষ, ব্যভিচার প্রভৃতি কার্য্যে ইংরাজগণ অতিশয় পটু ছিলেন। স্ত্রীলোক লইয়া বড় বড় ইংরাজের মধ্যে সর্ব্বদা মারামারি হইত। কিন্তু যেই ইংরাজ মহিলাগণ দলে দলে ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে লাগিলেন, অমনি ভারতীয় ইংরাজ-নীতি বদলাইতে আরম্ভ হইল।

এইরূপে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, যেখানেই নারীর সমাদর, সেইখানেই নীতির উন্নতি; নারী ও নীতি সঙ্গে সঙ্গে যায়। ইতিহাস যখন ইহাই প্রমাণ করিতেছে, তখন পূর্ব্বোক্ত নিন্দাবাদ কে অনুষ্ণভাবে সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি এ যুক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করাকেও বৃথা অপবাদের প্রশ্রয় দেওয়া মনে করিয়া ইহার উত্তর দিলাম না।

এতদ্ভিন্ন অবরোধ প্রথার সপক্ষগণ আর একটা কথা বলেন

তাহারও কিঞ্চিৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকাতে এই একটা সুবিধা হয়,যে আমরা নারীদিগকে নিজের মত করিয়া গড়িতে পারি। একটী নবপরিণীতা বালিকাকে বাড়িতে আনিলাম, পতি ভিন্ন সে অন্য পুরুষকে জানে না, এবং সেই বাড়ী ভিন্ন অন্য বাড়ী জানে না ; সুতরাং পতি ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাহাকে যে শিক্ষা দিবেন তাহাতে বাধা দিবার কেহ নাই,সে সেই প্রকারই গড়িয়া উঠিবে ; ঠিক্ আমাদের মনের মত হইবে। তাহা না হইয়া সে যদি দশজনের সহিত মিশিতে পায়, তাহা হইলে আমরা যাহা শিখাইব সে বাহিরে তাহার বিরুদ্ধ কথা হয়ত শুনিবে, কোন শিক্ষাই তাহার মনে দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহার উত্তর এই, যাহা সৎ তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে যাহা আছে তাহাই যে সতের আদর্শ, ইহা মনে করা মহাভ্রম। আর ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, পারিবারিক শিক্ষাই মানব চরিত্রে বলবতী হয়। বহুস্থানে গেলেও, বহুজনের সঙ্গে মিশিলেও অবশেষে দেখা যায় বালক বালিকা নিজ গৃহ ও পরিবারের প্রকৃতিই প্রকাশ করে। পরিবার মধ্যে যদি সমুচিতরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সে শিক্ষালব্ধ সদ্গুণ রাশিও রক্ষা করিবে অথচ বাহিরে যে কি সৎ ও সাধু বিষয় দেখিবে তাহাও অবলম্বন করিবে, এইত ভাল। এইত মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক উন্নতি। ছাঁচে ঢালার ন্যায় মানব মনকে সংকীর্ণ করিয়া গড়া, তত ভাল নয়।

এই প্রথার সপক্ষেরা আরও বলেন :—মানব হৃদয়ের প্রেম

বিস্তারে যত অধিক দূর ব্যাপ্ত হয়, ততই তাহার গভীরতা হ্রাস হইয়া যায়, যতই তাহা অল্প পরিসর স্থানে বদ্ধ হয়, ততই তাহা গভীর হইয়া থাকে। যাঁহাকে দুই শত লোককে, ভাল-বাসিতে হয় ও দুই শত লোকের চিন্তা করিতে হয়, তাঁহার প্রেম স্বভাবতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি স্বল্প পরিমাণে যায়, কিন্তু যাঁহার প্রেম দুইটী লোকেতে আবদ্ধ তাঁহার প্রেম পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অপেক্ষা প্রগাঢ়। এই সত্যটী স্মরণ রাখিলে অবরোধ প্রথার একটী সপক্ষ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকাতে বালিকা ও যুবতীগণ নিজ পতি ভিন্ন অপর পুরুষের সহিত মিশিতে পারে না, এবং পতির পরিবার ব্যতীত অপর কোন পরিবারের সহিত মিশিতে পারে না; অপর পুরুষের সহিত নিজ পতির তুলনা করিতে পায় না, সুতরাং আপন আপন পতিকেই প্রাণ মন দিয়া ভালবাসে, ও সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া মনে করে; তাঁহাদের প্রেম একমাত্রগামী হইয়া প্রগাঢ় ভাব ধারণ করে। যদি তাঁহাদিগকে যার তার সঙ্গে মিশিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাঁহারা কত পুরুষের সঙ্গে মিশিবেন, হয়ত নিজ পতি অপেক্ষা জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সাধুতাতে কত উৎকৃষ্ট লোক দেখিবেন, আর নিজ পতিদিগকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ভাবিবেন না; আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করিবেন না; তাঁহাদের প্রেম বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপরে ছড়াইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারা সেরূপ প্রেমিক থাকিবেন না।

ইহার উত্তর এই, দাম্পত্য প্রেম, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতির বিশেষ প্রকৃতি; অন্য কোন প্রেমে ইহাকে বাধা দিতে পারে

না। কোন রমণী যদি নিজ পতির অনুরাগিণী হন, কিম্বা দাস দাসীর প্রতি স্নেহশীলা হন, তাহাতে কি তাঁহার অপত্য-স্নেহ হ্রাস হইতে দেখা যায়? কিম্বা সন্তান-বাৎসল্যের জন্য কি দাম্পত্যপ্রেমের ব্যাঘাত হয়? বাহিরের দশজনের সহিত আলাপ পরিচয় হইলেই যে তাঁহাদের দাম্পত্যপ্রেম বা অপত্য-স্নেহ হ্রাস হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা করাই অমূলক। আর কার্য্যতঃও সেইরূপ দেখা যাইতেছে না। যে সকল সমাজে রমণীগণ বহু পুরুষের সহিত মিশিয়া থাকেন, তাঁহাদের দাম্পত্যপ্রেমের ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না। তবে যেস্থানে পরিণয় সুঘটিত হয় নাই, অর্থাৎ যেখানে নিজ পতিকে ভাল করিয়া না চিনিয়াই বিবাহ করিয়াছেন, অথবা প্রেমপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই, সেখানে পুরুষান্তরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ আশঙ্কা ঘোর অবরোধে আবদ্ধ রাখিয়াও দূর করিতে পারা যায় না।

আমার স্ত্রীটী বাহিরে গেলে পাছে আমার অপেক্ষা সৎ-লোক দেখে অতএব তাহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই; সে ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমাকেই সর্ব্বগুণশালী পুরুষ ভাবুক, ইহাই বা কিরূপ যুক্তি! জগদীশ্বর জগতে যত সাধুতা দিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকের জন্য; তাহা ঐ স্ত্রী-লোকেরও জন্য। তোমা অপেক্ষা সদ্‌গুণশালী পুরুষের সহিত মিশিয়া ঐ নারীর আত্মার যে উন্নতি হইবে তাহার পথ অবরোধ করিলে তুমি কি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে না? একবার ইংলণ্ডের এক জন রাজা একটী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে নিয়ম এই যে, রাজ-

সমাগমের সময় প্রজাদিগকে জানু পাতিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। রাজা যখন বিদ্যালয়টীতে গেলেন, তখন সমুদায় শ্রেণীর শিক্ষকদিগের নিকট সেইরূপ সমাদর লাভ করিলেন, কেবল সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে,—অর্থাৎ যে শ্রেণীতে ৪।৫ বৎসরের শিশুরা পড়িত—যখন আসিলেন তখন সেই শ্রেণীর শিক্ষক শিশুদিগের সমক্ষে রাজার প্রতি সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না; কিন্তু বাহিরে আসিয়া জানু পাতিয়া প্রজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন,—"মহারাজ! আমি যদি ক্লাসের মধ্যে আপনাকে এই সম্মান দিতাম, তাহা হইলে শিশুগণ জানিত যে আমা অপেক্ষাও বড় লোক পৃথিবীতে আছে। এখন তাহারা জানে, আমা অপেক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পদে বড় লোক জগতে নাই; এবং এই জ্ঞান থাকাতেই আমি তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে পারি। এই সংস্কার চলিয়া যাক্ আর আমি তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিব না।" অবরোধের সপক্ষগণের যুক্তি কি এই জাতীয় নয়? অসত্য ও ভ্রমের উপরে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত তাহা থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল। শাসনের অন্য ভিত্তি আছে। চরিত্রের দ্বারা, সাধুতার দ্বারা, ধর্ম্ম নিয়মের দ্বারা যে শাসন হয় তাহাই সুশাসন, এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন উপায়ে শাসন করা যায় তাহা আপাততঃ ফলদায়ক, কিন্তু চরমে সুফল প্রসব করে না।

অবরোধের সপক্ষগণের প্রদর্শিত আর কোনও যুক্তি মনে হইতেছে না। অতএব এক্ষণে এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে

কি কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার চেষ্টা করা যাউক :—

অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকাতে নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতি লাভের পথে সুমহৎ বিঘ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কি পুরুষ কি রমণী জ্ঞান লাভ করা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। এই জন্য ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা দিয়াছেন। মানব মনকে বলপূর্ব্বক অজ্ঞতার অন্ধকার মধ্যে ধরিয়া রাখিলে তাঁহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়, এবং তাহার অনিষ্ট ফলও ভোগ করিতে হয়। পুরুষের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-শিক্ষা যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নারীর পক্ষেও সেই-রূপ। কিন্তু এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকাতে নারী-গণের শিক্ষার উপায় বিধান করা দুষ্কর। আমাদের দেশে প্রায় ৪০ বৎসরকাল বালিকাদিগের শিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে এক একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রায় ২৫।৩০ বৎসর রহিয়াছে, অথচ স্ত্রীশিক্ষার কি বিশেষ উন্নতি হইয়াছে? বিদ্যালয়গুলি ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, অদ্যাপি তাহাই রহিয়াছে। ইহার এক-মাত্র কারণ এই যে, নবম বা দশম বর্ষ বয়সে কোন বালি-কার বিবাহ হইলেই, আর তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখা হয় না; তাহাকে পাঠ সাঙ্গ করিয়া অবরোধে আবদ্ধ করা হয়। একবার অবরুদ্ধ হইলে, শ্বশুর গৃহে সংসারের কাজে দীক্ষিত হইতে হয়; সুতরাং আর অতি অল্প বালিকারই ভাগ্যে বিদ্যালয়-লব্ধ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্নতি সাধনের সুবিধা থাকে। কোন কোন স্থানে দেখা গিয়াছে এরূপ অবরোধ

দশাতেও কোন কোন কুলকামিনী প্রবল জ্ঞান-পিপাসা দ্বারা চালিত হইয়া, নিজ পরিশ্রম ও যত্নের গুণে পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন; অথবা তাঁহাদের পতিগণ প্রকৃত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন; এইরূপে অবরোধ-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়াও কোন কোন প্রতিভাশালিনী রমণী সুলেখিকা হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সংখ্যা অতি বিরল। অধিকাংশ বালিকার ভাগ্যেই এই ঘটে যে, বিবাহের দিবস হইতেই তাহাদের সর্ব্বপ্রকার মানসিক উন্নতির দ্বার একেবারে বদ্ধ হইয়া যায়। বাল্যবিবাহ নারীর জ্ঞান লাভ ও মানসিক উন্নতির পরম শত্রু। নারীগণ একবার গৃহধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, এবং গর্ভ-ধারণ ও সন্তান-পালন ব্রতে ব্রতী হইলে, আর তাঁহাদের যথার্থ জ্ঞান লাভের স্বাধীনতা থাকে না। তখন গৃহধর্ম্ম ও সন্তান-পালন তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য হইয়া পড়ে এবং অপর সকল বিষয় গৌণ হইয়া যায়। কিন্তু যদি বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বঙ্গদেশে অবরোধ প্রথা না থাকিত তাহা হইলে বিবাহিতা হইয়াও বালিকারা যে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিত, তাহাও এদেশে হইতেছে না। অনেকে অবগত আছেন যে, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রমণীদিগের অবরোধ নাই। পুনা-নগরে বয়ঃপ্রাপ্ত হিন্দু মহিলাগণের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক বিবাহিতা যুবতী পাঠ করিয়া থাকেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ১৮।১৯।২০ বৎসরের বিবাহিতা বালিকারা দিব্য পায়ে বুট আঁটিয়া চাকরের হাতে পুস্তক ও বাক্স দিয়া, রাজ-

পথ দিয়া হাঁটিয়া স্কুলে যাইতেছে। তাঁহাদের শ্বশুর শ্বশুরগণ শিক্ষিত ও উদারনৈতিক লোক, এবং হয় ত ঐ বালিকাদিগের সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা বধূদিগকে ঐরূপ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন। বধূগিকে প্রকাশ্য পথ দিয়া ভৃত্য সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন শুনিয়া অনেকে হয় ত অবাক্ হইবেন। আরও শুনুন, বোম্বাই সহরে একদিন প্রাতে আমি একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহার বাড়ীতে আমার ছাতাটী ফেলিয়া আর এক বাড়ীতে গেলাম। যে বাড়ীতে পরে গেলাম তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। দ্বিতীয় বাড়ীতে গিয়া আমার স্মরণ হইলযে ছাতা ফেলিয়া আসিয়াছি। তখন সেই গৃহস্বামীকে বলিলাম "আপনাদের বৈবাহিক বাড়ীতে একটা ছাতা ফেলিয়া আসিয়াছি অনুগ্রহ করিয়া একটী ভৃত্য পাঠাইয়া ছাতাটা আনান।" তিনি একজন সম্পন্ন ও বোম্বাই সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহার গৃহে দাস দাসীর অপ্রতুল নাই। তিনি আমার কথা শুনিয়া একজনকে ডাকিলেন। আমি মনে করিলাম বুঝি কোন ভৃত্যের বা দাসীর প্রতি আদেশ হইতেছে। তাহা নয়, দেখি তাঁহার এক পুত্রবধূ আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন—"তোমার বাপের বাড়ীতে বাবু সাহেব ছাতা ফেলিয়া আসিয়াছেন, তুমিই গিয়া আন। কেমন, একবার মায়ের সঙ্গে দেখাটাও হয়ে যাবে বেশ নয়?" বালিকাটী মহা আনন্দে সেই কার্য্যে গমন করিল এবং আমাদের কথা শেষ না হইতে হইতে ছাতাটী আনিয়া দিল। যাউক, অবরোধ না থাকাতে পুনা নগরে পূর্ণবয়স্কা বিবাহিতা

বালিকারাও যেরূপ জ্ঞানোন্নতি করিতে পারিতেছেন, বাঙ্গালা দেশে যদি সেরূপও থাকিত, তাহা হইলেও নারীগণের এত শোচনীয় অবস্থা থাকিত না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, শিক্ষাতে যাহা ফলে তাহাত দেখিতেছি; বালিকারা এরূপ শিক্ষা না পাইল তাহাতে দুঃখ কি? সহস্র সহস্র যুবক যে শিক্ষা লাভ করিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে! তাহার চক্রের ভিতর যুবতীদিগকে ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন কি? শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা যে পদার্থ হইয়াছি নারীরাও ত তাহাই হইবে, তাহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? মেয়ে গুলো ভাল আছে তাহাদিগকেও মজাইয়া কি হইবে? বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রতি সকলে যে অভিযোগ করিতেছেন তাহা যদি সম্পূর্ণ সত্যও হয়, তথাপি তাহাতে এই প্রমাণ হয় না যে জ্ঞান লাভ করা নারীর পক্ষে অনাবশ্যক। সর্ব্বপ্রযত্নে বর্ত্তমান প্রণালীর উন্নতি কর; তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কি পুরুষ, কি রমণী সকলকে ধর্ম্মানুরাগ শিক্ষা দেও, শিক্ষার চরম লক্ষ্য যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহা যাহাতে তাহারা লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহা কর, শিক্ষার দ্বার বন্ধ করিতে চাও কেন? সে দ্বারকে পুরুষ ও রমণী উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু অবরোধপ্রথা থাকাতে সে দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াও কোন ফল নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ত্তমান বেথুন স্কুলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে আমরা নারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছি, কিন্তু কতকগুলি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টীয় বালিকা ভিন্ন আর কোন নারীকেই সে শিক্ষা লাভের জন্য অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। সেখানেও হিন্দু বালিকাগণ বিবাহের

পর আর বিদ্যালয়ে আসে না। এইরূপে অবরোধপ্রথা নিবন্ধন নারীর জ্ঞানলাভ ও মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যে কেবল গ্রন্থ পাঠ করিয়াই শিক্ষা করি তাহা নহে, জনসমাজে মিশিয়া আমরা প্রতিনিয়তই শিক্ষা করিতেছি। পরস্পরের নিকট হইতে কত সত্য উপার্জ্জন করিতেছি। এই সামাজিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আমাদের দেশে একটী কথা প্রচলিত হইয়াছে "যদি না পড়ে পো তো সভার মাঝে থো"। বাস্তবিক যে গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা কিছুই শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহাকে যদি দশজনের সঙ্গে রাখা যায়, তবে সে অনেক শিক্ষা করে। কিন্তু আমাদের দেশে অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকাতে এই হইয়াছে যে, বাহিরের কোন আলোক নারীগণের মনে প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা দশজনের সঙ্গে মিশিয়া, সভা বক্তৃতা প্রভৃতিতে গিয়া যে সকল নূতন মত, নূতন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কিছুই তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না; অথচ সমাজের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের কুশিক্ষা দিবার যাহা কিছু আছে, তাহা অবাধে তাঁহাদের উপরে কার্য্য করিতে পায়। মনে করুন একজন শিক্ষিত যুবক তাঁহার পত্নী, বা ভগিনীর মানসিক উন্নতির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; তাঁহার পথে কত বিঘ্ন। তিনি যে সকল উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এই যুবতীর নিকট সে সমুদায় দ্বার বদ্ধ। তিনি নিজে যাহা কিছু শিখাইতেছেন, চতুর্দ্দিকের বৃদ্ধা নারীগণ তাহার বিপরীত শিক্ষা দিয়া তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষাকে ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে তাঁহার নিতান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও তিনি মনের মত

করিয়া শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত যুবকগণ প্রতিদিন যে সকল উন্নত মত ও ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের পত্নীগণ বা ভগিনীগণ তাহার অংশী হইতে পারিতেছেন না; শিক্ষার আলোক তাহাদের গৃহপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; সুতরাং তাঁহারা সেই শিক্ষা অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

তৃতীয়তঃ, নারীগণের প্রতি সচরাচর এই অভিযোগ করা হয় যে তাঁহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা অতি তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত ও সেই জন্য বিবাদপরায়ণ হন; নিজ পরিবারের প্রতি তাহাদের স্নেহ মমতা আছে, কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি দয়া অল্প; এই সকল কারণে এ দেশে রমণীগণের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব জন্মিয়া গিয়াছে। দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যেখানে যত গৃহ বিচ্ছেদ ঘটনা হয়, ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে বিরোধ উপস্থিত হয়, পরিবারের মধ্যে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, নারীগণ তাহার মূলে। "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—এই বাক্যটীর দ্বারা লোকে সর্ব্বদা এই অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একবার চিন্তা করেন না যে আমরা নারীগণকে যে দশায় রাখিয়াছি, তাহাতে ইহার অতিরিক্ত আর কিছু আশা করা যায় না। তাঁহারা অবরোধে অবরুদ্ধ থাকাতে নিজ গৃহের চতুঃসীমার বাহিরের কোন বিষয় জানিতে পারেন না, বাহিরের লোকের সুখ দুঃখ চক্ষে পড়ে না, সুতরাং তাঁহাদের স্নেহ দয়া এক সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ে। বহুদর্শন ও চিন্তা শক্তির বিকাশই

মানবকে উদারতা শিক্ষা দেয়; এবং প্রকৃত জ্ঞানোন্নতিই মানব হৃদয়ের সংকীর্ণতাকে দূর করে। যাহাদের কোন প্রকারের উন্নত বিষয়ে ভাবিবার শক্তি ও শিক্ষা নাই, তাহারা যে ক্ষুদ্র. ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? যাহারা বাহিরের জগতের পদার্থ বড় অধিক দেখিতে পায় না, তাহারা যে গৃহ-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যকেই প্রকাণ্ড রাজ্য মনে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সকলেই বলেন যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষুদ্রাশয়তা অধিক; কিন্তু একবার বিচার করিয়া দেখেন না যে পুরুষগণ যেরূপ শিক্ষা পান, তাহাতে ক্ষুদ্রাশয়তা থাকে না। নারীগণ সেইরূপ শিক্ষা ও কার্য্যক্ষেত্র পাইলেও তাঁহাদের ক্ষুদ্রাশয়তা থাকিবে না।

চতুর্থতঃ নারীগণ অশিক্ষিতা ও অবরোধে আবদ্ধ থাকাতে সকল প্রকার সামাজিক উন্নতির বেগ মন্দীভূত হইতেছে। পুরুষগণ কত স্থানে যাইতেছেন, কত বক্তৃতা শুনিতেছেন, কত সভাতে উপস্থিত থাকিতেছেন, কত রাজনীতি সংস্কার সমাজ সংস্কার বা ধর্ম্ম সংস্কারের ভাব তাঁহাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই উদ্দীপ্ত অগ্নি গৃহে আসিয়া আশ্রয় বা সাহায্য পাইতেছে না; আত্মীয় পরিবারগণের সহিত সংঘর্ষণে ক্রমে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছে। রমণীগণ সেই সকল ভাব প্রাপ্ত হইলে ও সেই সকল কার্য্যের সহায় হইলে, দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কত দ্রুত গতিতে হইতে পারিত।

পঞ্চমতঃ; রমণীগণ অবরোধে আবদ্ধ থাকাতে তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা প্রতিনিয়ত এই অনুভব করিতেছেন যে পুরুষের যে অধিকার আছে

তাঁহাদের সেই অধিকার নাই। তাঁহাদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল থাকাতে, কোন প্রকার মহত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে উদয় হইতেই পারিতেছে না। আমরা মেয়ে মানুষ আমরা আবার কি করিব? সকল বড় বিষয়ে তাঁহাদের মুখে এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আত্ম-মর্য্যাদা-লোপের ন্যায় মনুষ্যত্ব লাভের প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন আমাদের দেশের পুরুষগণ নারীদিগকে সমাদর করিতে জানেন না; স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহাদের ঘোরতর অবজ্ঞা আছে। আমিত দেখিতে পাই যে নারীদিগের ন্যায় নারীর অবজ্ঞাকারী কেহ নাই। আমাদের স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীজাতিকে ভয়ানক ঘৃণা করেন। কোন গৃহস্থের ভাগ্যে যদি উপর্য্যুপরি কয়েকটী কন্যা জন্মে, রমণীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; "দূ'র দূ'র কতকগুলো মেয়ে"। নারীগণের নিজেদের প্রতি এই ঘোর অবজ্ঞা থাকাতে সমাজের পুরুষদিগের নীতি দূষিত হইতেছে। তাঁহারা নারীদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিতেছেন না। পুরুষগণ দুশ্চরিত্র হইতেছে, স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে দশজন নারী মিলিলে বলিতেছেন—"পুরুষের ওরূপ দোষ ঘটিয়াই থাকে"; অর্থাৎ দুশ্চরিত্রতা বিষয়ে পুরুষের যে অধিকার আছে নারীর তাহা নাই। যে আত্ম-মর্য্যাদার অভাবে সমাজের এই সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার মূলে অবরোধ-প্রথা।

ষষ্ঠতঃ; অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকাতে আমাদের পারিবারিক সুখেরও ব্যাঘাত হইতেছে। গৃহমধ্যে পরিবারস্থ

সমুদায় লোক যত অসংকোচে পরস্পরের সহিত মিশিবেন ততই গৃহ সুখের স্থান হইবে। বিশেষতঃ নারীগণ গৃহের জ্যোৎস্না স্বরূপ, তাঁহারা যদি অসংকোচে প্রাণ খুলিয়া পুরুষ আত্মীয়দিগের সহিত মিশিতে না পান, তাহা হইলে পারিবারিক সুখের অর্দ্ধেকের অপেক্ষাও অধিক হ্রাস হইয়া যায়। কিন্তু যে অবরোধ প্রথা নারীগণকে বাহিরে মিশিতে দেয় না, সেই প্রথাই গৃহের মধ্যে তাঁহাদিগকে পুরুষ আত্মীয়দিগের সহিত অসংকোচে মিশিতে দেয় না। এক জনের ভ্রাতৃজায়া বা ভাদ্রবধূগণ তাঁহার সহিত মিশিতে পারেন না; কিংবা তাঁহার পত্নী বা ভগিনীগণ তাঁহার পুরুষ বন্ধুগণের সহিত মিশিতে পারেন না। এইরূপে পারিবারিক সুখ অনেক হ্রাস হইয়া যায়। পরিবার মধ্যে সুখের অল্পতা হওয়াতে পুরুষকে সুখের আশায় বাহিরে যাইতে হয়; এবং বাহিরের নানা প্রকার প্রলোভনে পড়িতে হয়। এইরূপে এই বঙ্গদেশে কত সহস্র পুরুষ আমোদ প্রমোদের লোভে বাহিরে গিয়া প্রলোভনে ও পাপে পতিত হইতেছে, তাহা কি কেহ গণনা করিয়া বলিতে পারেন? সামাজিক নীতি সম্বন্ধে এই একটা মূল কথা আমাদিগকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, পরিবার মধ্যে প্রেম, স্বাধীনতা ও নির্দ্দোষ আমোদ যত রাখিতে পারিব ততই সামাজিক নীতি সুরক্ষিত হইবে। অবরোধ প্রথা এই তিনটীরই বিরোধী।

সপ্তমতঃ যে সকল দেশে নারীগণের বাহিরে যাইবার অধিকার আছে, সেখানে পুরুষগণ নারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ

করিতে পারেন না। যদি রঙ্গভূমিতে কোন প্রকার অভিনয় দেখিতে যাইতে হয় পত্নীগণ পতিগণের সঙ্গী, যদি কোন স্থানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হয় পত্নীগণ সঙ্গী, যদি কোন নাচ তামাসাতে যাইতে হয় পত্নীগণ সঙ্গী। এইরূপে এক সঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পত্নীগণ সমভিব্যাহারে থাকাতে পতিগণের পবিত্রতা সুরক্ষিত হয় এবং পতিগণ সমভিব্যাহারে থাকাতে পত্নীগণও পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা পান। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত কাণ্ড ঘটে। আমোদ প্রয়াসী পুরুষগণ সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদের পত্নীগণ গৃহে পড়িয়া থাকিতেছেন; সুতরাং চরিত্রের পাহারা সঙ্গে না থাকাতে পুরুষগণ অশেষ পাপে নিমগ্ন হইতেছেন। এমন কি অনেক সময় বাহিরের বৈঠকখানাতে পাপ ক্রিয়া চলিতেছে পত্নীগণ অন্তঃপুরে থাকিয়া সংবাদ পাইতেছেন না।

অষ্টমতঃ এই দারুণ অবরোধ নিগড়ে আবদ্ধ হওয়াতে নারীগণ তাঁহাদের ঈশ্বরদত্ত শক্তি সকলকে জনসমাজের কল্যাণের জন্য, পাপ তাপ দুর্নীতি নিবারণের জন্য ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। অন্যান্য দেশে বর্ত্তমান সময়ে নারীগণ জনসমাজের কি সুমহৎ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছেন, তাহা দেখিলে এই ক্ষোভ আরও দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। আমেরিকার বিগত ১০।১৫ বৎসরের সামাজিক আন্দোলনের বিবরণ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই জানেন সেখানে রমণীগণ কি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সেখানে কেবলমাত্র রমণীদিগের একটী সুরাপান নিবারণী সভা আছে তাহার সভ্য সংখ্যা দেড় লক্ষেরও অধিক। কুমারী উইলার্ড

নাম্নী এক রমণী ইহার অধিনায়িকা। ইনি তদ্দেশীয়া সুশিক্ষিতা রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা। পার্থিব সুখ অন্বেষণ করিলে সে দ্বার ইহার জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু ইনি সে সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও চিরকৌমার্য্য ধারণ পূর্ব্বক স্বদেশের দুর্গতি নিবারণ কার্য্যে দেহ মন অর্পণ করিয়াছেন। দেড় লক্ষ স্ত্রীলোকের সভার ইনি অধিনায়িকা। উক্ত সভার শাখা সভার সংখ্যা দশ হাজার। এই দেড় লক্ষ স্ত্রীলোক বিগত দশ পনর বৎসর দেশ হইতে সুরাপান প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউনাইটেড ষ্টেটের কোন কোন দেশে এইরূপ রাজবিধি করাইয়া লইয়াছেন, যে সেখানে সুরার দোকান খুলিবার যো নাই। ইহারা বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী নানা প্রকার গ্রন্থ রচনা করিতেছেন তাহাতে সুরা বা অন্য কোন প্রকার মাদক সেবনের অনিষ্ট-কারিতা অতি উত্তম রূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন। এইরূপে ইহারা পুরুষদিগের সুরাসক্তিকে অনেক পরিমাণে সংযত করিয়া আনিয়াছেন। সম্প্রতি এই দেড় লক্ষ রমণীর সভা পুরুষদিগের নীতির উন্নতির দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। ইহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে রমণীকে যে নীতির নিয়মে বাঁধা হয় পুরুষদিগকেও সেই কঠিন নিয়মে বাঁধিবেন। ইহাদের অধিনায়িকা কুমারী উইলার্ড (Willard) একটী মূল সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা এই ;—"If one woman ought to be pure, all women ought to be pure, if all women ought to be pure all men must be pure"—অর্থ "যদি একজন স্ত্রীলোকের সতী হওয়া আবশ্যক হয়, সকল স্ত্রীলোকেরই সতী

হওয়া আবশ্যক, সকল স্ত্রীলোককে যদি সতী থাকিতে হয় সকল পুরুষের ও সৎ হওয়া অপরিহার্য্য'। এই মূল সূত্র অনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীন কারবার পথ উন্মুক্ত না থাকিলে কি তাঁহারা এরূপে কার্য্য করিতে পারিতেন ? কখনই না।

অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক নারীর অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকাতে কেবল যে নারীগণের দুর্গতি তাহা নহে সেই সঙ্গে পুরুষদিগের ও সমগ্র সমাজেরও দুর্গতি। বিধাতা এই দুর্গতি হইতে বঙ্গসমাজকে রক্ষা করুন।